KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5-6	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৮৫ আশ্বিন, ১৩৮৫ কার্তিক, ১৩৮৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ পৌষ-মাঘ, ১৩৮৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় রায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম বর্ষ | পত্রিকা | পৌষ + মাঘ
পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা | সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র | ১৩৪৬

প্রবাসে বাংলা সাহিত্য

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

স্বদেশে বহু প্রবীণ সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও যে আপনারা আমাকে এই সুদূর প্রবাসে ডেকে এনে সভাপতিত্বে বরণ করে' সম্মানিত করেছেন সেজন্য আপনাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শিক্ষক হিসাবে নেহাৎ অর্ব্বাচীন না হ'লেও আমি সাহিত্য বিষয়ে প্রবীণতা দাবী করা দূরের কথা কোন অধিকারের অভিমানও করতে পারি না। যথার্থ সাহিত্যিক হচ্ছেন রসস্রষ্টা, আর প্রাচীন সাধুজনের মতে রস হচ্ছে সেই বস্তু যা মনকে ব্রহ্মানন্দের অনুরূপ আনন্দরসে আপ্লুত করে। এই রসের সৃষ্টি করতে পারেন সেই লেখক যাঁর দৃষ্টি পৌঁছায় এই নিরন্তর প্রবহমান জীবনস্রোতের অন্তঃস্তলে, আর সে দর্শনশক্তি লাভ করা যায় বহুকালব্যাপী সাধনার ফলে।

সাহিত্যে এই অনধিকার সত্ত্বেও আমি যে আপনাদের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করেছি তার কারণ অত্যন্ত ব্যক্তিগত। ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্বগতি অনুসরণ করবার জন্য আমি বহুদিন পূর্ব্বেই ইন্দোচীন প্রদেশে প্রাচীন ভারতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি দেখেছি। আপনারা জানেন যে প্রাচীনকালে বিশাল ভারতের সীমানা পূর্ব্বে চীন-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, খৃষ্টীয় প্রথম শতক হতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত শ্যাম, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, ইন্দোচীনে কম্বুজ রাষ্ট্র, বর্ত্তমান কাম্বোডিয়া, চম্পা—বর্ত্তমান আনাম, মলয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা নিয়ে গঠিত শ্রীবিজয় রাজ্য, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি রাজ্য ছিল সর্ব্বতোভাবে ভারতীয়। সেখানকার অধিবাসীদের শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান সমস্তই ছিল ভারতীয়, আর এই রাজ্যগুলি ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে' সে সব দেশে ভারতবাসীর গতিবিধি ছিল সহজসাধ্য। ভারতীয় সভ্যতার এই পূর্ব্বগতির ইতিহাসের মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে গেলে ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সঙ্গে যে-পরিচয় থাকা আবশ্যক তা কেবলমাত্র পুঁথিপত্র হতে সংগ্রহ করা চলে না, সে-দেশের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় থাকারও আবশ্যক। সুতরাং আপনাদের এই সাহিত্য সম্মেলন আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে বলে' আমি আপনাদের আহ্বান শিরোধার্য্য করে' নিয়েছি। আপনাদের সাহচর্য্য

নিখিল ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

লাভ করবার সুযোগও আমার পক্ষে তুচ্ছ নয়। আপনারা এই দূরে প্রবাসে এসে স্বদেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর ভারতের আর এক কোণে যে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে' তুলছেন তার একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগই মানুষের মনকে সমৃদ্ধ করে, নীরস দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কথঞ্চিৎ সরস হয় এবং সাহিত্য ও শিল্পে নূতন সৃষ্টির উৎস প্রসারিত হয়।

ইতিপূর্বে বলেছি যে আপনারা এই প্রবাসে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে' তুলেছেন। আপনারা যে অবাঙ্গালী হয়ে পড়েছেন এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। প্রাচীনকালে স্বদেশে ভগ্নমনোরথ বণিকেরা সুবর্ণভূমিতে আসতেন সুবর্ণসংগ্রহের লোভে, আর নিজেদের পণ্যের বিনিময়ে দ্বীপান্তর হতে নিয়ে যেতেন বিপুল ধনরত্ন আর বিদেশ সম্বন্ধে নানা রূপকথা। এই রূপকথার মধ্যে বাস্তব জীবনের কোন স্মৃতিই খুঁজে পাওয়া যায় না। সুবর্ণভূমিতে যে সুবর্ণের আধিক্য নাই তা সে-দেশ না দেখলেও আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি। আর সমুদ্রপথে যে-সব জীবজন্তু, তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিলগিল প্রভৃতি তাঁদের ভয়োৎপাদন করত—তারা যে কল্পলোকের সামুদ্রিক জীব সে-কথাও আমাদের বুঝতে দেরি হয় না। আপনারা যে সেই প্রাচীন বণিকদের সমব্যবসায়ী নন, তা আমরা সকলেই জানি।

যদিও আপনারা এ দেশে ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হবার পর এসেছেন তবুও এ কথা মনে করা ভুল যে সেই শাসন কার্য্যে সহায়তা করাই হচ্ছে আপনাদের একমাত্র কার্য্য। এই নূতন জগতে আপনারা যে স্থানীয় সুবিধাসীদের উন্নতির নানা নূতন পথ খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছেন তা এ-দেশের লোকেরাও স্বীকার করেন। আপনাদের নিজেদের ছিল শিক্ষা ও দীক্ষা এবং আপনারা ছিলেন একটি উন্নত শিল্প ও সাহিত্যের উত্তরাধিকারী। সেই কারণে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে আপনাদের কোন চেষ্টার অভাব ছিল না। কিন্তু সে-চেষ্টা সত্ত্বেও প্রবাসী-বাঙ্গালী-সংস্কৃতি যে স্থানীয় সভ্যতার স্পর্শ পাবে না, এ-কথা বিশ্বাস করা চলে না। স্থানীয় লোকের সঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন বশতঃ প্রবাসী সমাজ কিছু নূতন রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, শুধু অশন-বাসন কিংবা আচার ব্যবহারের সামান্য খুঁটিনাটিতেই এই পরিবর্ত্তন ঘটে তা নয়, নূতন অবস্থার মধ্যে মনের গতিও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং সেই মনের সৃষ্টি, সাহিত্য এবং শিল্পেও নূতন উপাদানের সমাবেশ হয়, এবং সেই উপাদানের স্বভাব বশতঃ নূতন রংয়ের সৃষ্টি হয়।

মানুষের মন নিত্য নূতন সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সে-মন সম্পূর্ণ স্বাধীন বস্তু নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সে-মনের গতি বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই কারণে একই সংস্কৃতি নানা প্রদেশে নব নব রূপ গ্রহণ করে। আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস হতেই উদাহরণ সংগ্রহ করা চলে, আর্য্যভাষা-ভাষীরা মূলতঃ একই সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল। শুধু ভাষা নয় তাদের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, সমাজ শাসনপ্রণালী একই ছিল, কিন্তু সে-জাতি যখন বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তার নানা শাখা বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে তখনই তাদের সংস্কৃতি বিভিন্ন হয়ে পড়ে। গ্রীক, ইরাণীয় এবং বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে অনেক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রীক Zeus pater (Jupiter) এবং বৈদিক দ্যৌসপিতর মূলতঃ এক দেবতা হলেও তাদের মধ্যে প্রভেদ বহু, গ্রীক Uranus এবং বৈদিক বরুণের মধ্যেও প্রভেদ অনেক। ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে

বৈদিক যুগেই যে বর্ণবিভাগের খোঁজ পাওয়া যায়, আর্য্যদের অন্যান্য শাখার মধ্যে তার অনুরূপ কোন সমাজ-বিধান পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং একই আর্য্যসভ্যতা যে বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে নূতন নূতন জাতির সংস্পর্শে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে সে-কথা অস্বীকার করা চলে না।

সাহিত্য এবং শিল্পও এই প্রভাব হতে মুক্ত নয়। উত্তর ভারতে আর্য্যভাষা নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পরিণতি লাভ করেছে। সাহিত্যও সেই কারণে নানা রূপ গ্রহণ করেছে, প্রাকৃত যুগে মাগধী, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃত সাহিত্য, পরবর্ত্তীযুগে নানা প্রাকৃতকে অবলম্বন করে' যে-সব অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হয় সে-ভাষায় রচিত নানা সাহিত্য, এবং খৃষ্টীয় দশম শতক হতে নানা প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে নানা প্রাদেশিক সাহিত্য আবেষ্টনীর তারতম্য অনুসারে সংস্কৃতির বহুমুখিত্বই প্রতিপাদন করে।

সংস্কৃত সাহিত্যের রচনা-রীতিতেও বিভিন্নতা ধরা যায়। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ এই রচনার চারটি রীতির কথা উল্লেখ করে' গেছেন। বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী। প্রত্যেকটি রীতি প্রদেশ বিশেষের নামের সঙ্গে জড়িত। বিদর্ভ হচ্ছে বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ, রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান, গৌড় উত্তরবঙ্গ। শাস্ত্রকারেরা বৈদর্ভী রীতির দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন—শ্লেষ প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধিগুণ। গৌড়ী রীতির প্রধান লক্ষণ ছিল শৈথিল্য, অল্পপ্রাণ অক্ষরের ব্যবহার, অনুপ্রাস এবং রূঢ় বা কর্কশতার অভাব। সংস্কৃত সাহিত্যে পরবর্ত্তীকালে রীতির ব্যবহার প্রাদেশিকতার গণ্ডী অতিক্রম করেছিল সত্য, কিন্তু তার সৃষ্টির মূলে যে প্রাদেশিক মনোভাব ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। বিদর্ভ ছিল গোদাবরী নদীর উপত্যকায়, সে নদীস্রোতের গতি বাংলার নদনদীর মত অব্যাহত নয়, সে-দেশের ভূমিভাগ বাংলার দিগন্তবিস্তৃত সমতলভূমি নয়, বাংলাদেশের জলবায়ু মনে যে-শৈথিল্য ও উদাসভাব আনে সে-দেশে তা আনে না, সেই কারণে বাঙ্গালীর রচনা-রীতির গুণ যে বিভিন্ন হবে তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কোন কারণ নাই, জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে' সম্পূর্ণভাবে গৌড়ীয়, অন্য প্রদেশে তার অনুকরণ হতে পারে মাত্র, সহজভাবে সৃষ্টি হতে পারে না।

ভারতীয় শিল্প ও সঙ্গীতে প্রেরণা মূলতঃ এক হ'লেও প্রাদেশিক সংস্কৃতির ছাপ তাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে গ্রীক ও শকদের সংস্পর্শে ভারতীয় শিল্পের ইন্দোগ্রীক এবং ইন্দোশক নামক যে দুটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্ত্তন হয় তা দক্ষিণ ভারতের অমরাবতী অঞ্চলের শিল্পের ধারা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্থাপত্যে বাংলা দেশ, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের রচনারীতির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। চিত্রকলায় বাংলার পট, নেপালী চিত্র, রাজপুত চিত্র প্রভৃতি নানা বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করেছে, অথচ তাদের প্রেরণা মূলতঃ একই ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সুরে গৌড়ী, গৌড় সারং, কর্ণাটী, ভূপালী, খাম্বাজ প্রভৃতি প্রাদেশিক নামের সঙ্গে জড়িত, আর ভারতীয় সঙ্গীতের নানা ঢং বা style-এর মধ্যে বাউল, কীর্ত্তন, ভজন প্রভৃতি যে নানা প্রাদেশিক সৃষ্টি, তা সকলেই স্বীকার করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃতির গতি প্রাদেশিক আবেষ্টনীর প্রভাব হতে মুক্ত নয়। কোনও দেশের জলবায়ু, নদনদী, পর্ব্বতমালা, সমতলভূমি, সে-দেশের স্বভাবজাত শস্যসম্পদ, স্থানীয় অধিবাসী ও তাদের রচিত পথঘাট প্রভৃতি এই আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে। দেশান্তর হতে আগত জাতি বা জনসঙ্ঘ নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণবশতঃ এই নূতন আবেষ্টনী লঙ্ঘন করতে চায় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ তার প্রভাব অস্বীকার করে' নিতে বাধ্য হয়। সেই কারণে বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রভাবে প্রবাসী ইউরোপীয় কিছুকাল পরেই প্রত্যহ স্নান করতে বাধ্য হন, পাদবন্ধন শিথিল করেন এবং rice and curry র প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু প্রবাস ও মনের মধ্যে সম্পূর্ণ সহজ সম্বন্ধ স্থাপনে পরাঙ্মুখতার জন্যই সাহিত্য বা সুকুমার-শিল্প সৃষ্টিতে অসমর্থ হয়ে পড়েন।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জাত্যভিমান মনকে কোন প্রশস্ত মানবিকতার ভূমিতে পৌঁছে দেয় না, বরং তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট করে' জীবনকে মধুরতর করে' তোলবার পথে অন্তরায় ঘটায়। প্রবাসী বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে এ অভিযোগ নাই তা নয়। ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত থেকেই আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যায় অধিকার লাভ করেছিলাম বলে' অনেক বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের বহু পূর্ব্বেই বর্ত্তমান যুগোপযোগী উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিলাম বটে কিন্তু বিদেশ হতে ফল-ফুল আহরণ করে' নিজেদের সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করবার কথা কখনো ভাবি নাই,—জাত্যভিমানের জন্যই। বাংলা সাহিত্য বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যকে অতিক্রম করে' গেছে, এ কথা সত্য। কিন্তু সেই কারণে এ কথা মনে করা অসঙ্গত যে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে কোন উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হয় না। অন্যান্য সাহিত্যের গতির দিকে দৃষ্টিপাত না করা কিম্বা অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতির প্রভাব এড়িয়ে চলবার চেষ্টার পেছনে কোন সত্যকার যুক্তি নাই।

আপনারা যে-দেশে বসবাস করছেন সে-দেশও বহুকাল ধরে' ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট ধারা রক্ষা করে' এসেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা সমুদ্রপথে মলয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ব্রহ্মদেশের প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ খুব সম্ভবতঃ ছিল দক্ষিণ প্রদেশে, থাটন অঞ্চলে। ব্রহ্মদেশে রচিত নানা পালি গ্রন্থে যে জনপ্রবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বিশ্বাস করলে মানতে হয় যে মৌর্য্যবংশীয় অশোকের প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারক—সোন এবং উত্তর সুবর্ণভূমি বা থাটনেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই থাটন হতেই পালি বৌদ্ধসংস্কৃতি ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। পাগানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনোরত এই থাটন হতে পালি বৌদ্ধ ত্রিপিটক এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধাচার্য্যদের পাগানে নিয়ে যান।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হবার পূর্ব্বে এ-দেশের নানা স্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সে-ধর্ম্ম এসেছিল খুব সম্ভব স্থলপথে উত্তর ভারত হতে, এই ধর্ম্মের অনেক প্রভাব ব্রহ্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে ধরা পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এদেশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সঙ্গে সংযোগ হারায় নি। সেই কারণে বৌদ্ধ আচার্য্যেরাও বেদশাস্ত্র—অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি পঠন-পাঠন করতেন। ব্রাহ্মণ্য-

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

ধর্ম্ম হতে এই সমস্ত উপাদান অঙ্গীকার করে' নেবার দরুণ ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধসংস্কৃতি সিংহলের বৌদ্ধসংস্কৃতি অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মদেশের আচার্য্যদের রচনা হতেই একথা প্রমাণিত হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে পাগানের এক আচার্য্য অগ্রবংস সদ্ধনীতি বা শব্দনীতি নামক যে বিরাট ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন সেরূপ গ্রন্থ অন্য দেশের পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এর কিছুকাল পরেই সাসনবংস, গন্ধবংস প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের আলোচনা এদেশের বৌদ্ধবিহারে পরবর্ত্তীকালেও করা হয় এবং নানা গ্রন্থ ও টীকাটিপ্পনী রচিত হয়। পরবর্ত্তীকালে পালি ভাষায় যে-সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধম্মথাত রচিত হয় তা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকে অনুসরণ করে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত অভিধর্ম্মের আলোচনায় ব্রহ্মদেশের আচার্য্যগণ এক সময়ে বৌদ্ধজগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং নানাস্থান হতে বৌদ্ধভিক্ষুরা তাঁদের নিকট অভিধম্ম শিক্ষার জন্য আসতেন। বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে' এ দেশে একটি বিরাট প্রাদেশিক সাহিত্য গড়ে' ওঠে, এবং কথাসাহিত্য, নাটক, প্রভৃতি অনুপ্রেরণা পায় এই জাতক হতে।

এ থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা বৌদ্ধ সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও সিংহলী বৌদ্ধদের অনুকরণ করে নি, তাকে একটি নিজস্ব সংস্কৃতিতে পর্য্যবসিত করেছে। এ দেশের যে-সব আচার্য্যেরা সিংহল থেকে অধ্যয়ন করে' এসেছিলেন তাঁরা একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধসঙ্ঘ গড়ে' তুলেছিলেন। তার নাম ছিল সিংহলসঙ্ঘ। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্ম্মকে "সিংহলের মত করে' গড়ে' তোলা। কিন্তু এ দেশের বৌদ্ধাচার্য্যেরা এই সিংহলসঙ্ঘকে নেক নজরে দেখেন নাই, সিংহলের অধীনতাও স্বীকার করেন নি, বরং তার বিরোধিতাই করেছিলেন।

তাঁরা এই স্বাধীন মনোভাব রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলেই ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি তার সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিল। এ দেশের অধিবাসীরা স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতিতে এমন নূতন সৃষ্টি করতে পেরেছিল যা আজও আমাদের মনকে অভিভূত করে। পালি সাহিত্যে তাদের নিজস্ব অবদান সে-সাহিত্যের পাঠক মাত্রের নিকটেই অতি মূল্যবান। এ দেশের নাটক, নৃত্যকলা, সঙ্গীত প্রভৃতিও এই কারণেই এমন সুরুচি সম্মতভাবে পরিণতি লাভ করেছিল যে তা বিগত শতকের শেষভাগ পর্য্যন্তও ব্রহ্মবাসীদের মন সরস করে' রেখেছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এ দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার সত্ত্বেও সেই প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

সুতরাং ব্রহ্মদেশের এই বিরাট সংস্কৃতি প্রবাসী বাঙ্গালীর অবহেলার বস্তু নয়, সে-সংস্কৃতি যে ভারতীয় সভ্যতার একটি ক্ষীণ ধারা মাত্র রক্ষা করে' আসছে তা মনে করবার কোন কারণ নাই। এ দেশের জাতির সহজ গুণাবলীর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতার সে ধারা এই ব্রহ্মদেশের আবেষ্টনীর মধ্যে এমন একটা অভিনব সংস্কৃতি গঠন করেছে যার মধ্যে সহানুভূতি সম্পন্ন প্রবাসী বাঙ্গালী নিজেদের মনকে সমৃদ্ধ করবার অনেক উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন।

অতএব প্রবাসে এই নূতন আবহাওয়ার মধ্যে, নূতন প্রকৃতির ক্রোড়ে এই দেশের রস

আহরণ করা ছাড়া বাঙ্গালীর অন্য উপায় নাই। 'এই দেশের প্রাকৃতিক শোভা, নদনদী ও পর্ব্বতমালাকে অবলম্বন করেই তাঁর মন বেড়ে উঠতে পারে, নূতন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হতে পারে। এ অবস্থায় জাত্যভিমান বর্জ্জন করে' এবং এ-দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করে' তাঁরা এই দেশীয় সংস্কৃতি হতে যে উপাদান সংগ্রহ করবেন তা তাঁদের রচিত সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষ বর্দ্ধন করবে। তাতে শুধু যে তাঁদের সাহিত্য ও শিল্পই নূতন রাগে রঞ্জিত হবে তা নয়, তাতে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই লাভবান হবে, বাঙ্গলার জাতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করবে, এবং বাঙ্গালী-মনের সৃষ্টির পটভূমিকা পরিসর প্রাপ্ত হবে।

সুতরাং জাত্যভিমান বশতঃ স্থানীয় প্রভাব হতে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা আত্মঘাতী। সে চেষ্টা পরিশেষে ফলবতী হয় না; উপরন্তু নিজেদের মনে এমন আড়ষ্টতার সৃষ্টি করে যা আমাদের ব্যক্তিগত ও সংহত জীবনে অমঙ্গল আনয়ন করে। এই অভিমানই আমাদের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হতে দেয় নি। ইংরাজী সাহিত্যকেই চরম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য আমাদের সাহিত্যে অতি আধুনিক সৃষ্টি হয়েছে অনুকরণবহুল, তার ভাব ও ভাষা হয়ে পড়েছে অতি অপরিচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্য হতে যে আমরা নানা প্রেরণা পেয়েছি তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সত্যকার প্রেরণার অভাব ঘটলেই আসে অনুকরণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার যেটুকু আমাদের মনকে আন্দোলিত করে সেইটুকুই গ্রহণযোগ্য, যা আমাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে না তা অনুকরণ করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ভারতীয় জীবন নানা কারণে হয়ত তার সহজ গতি হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু সে অবরুদ্ধ স্রোতকে গতিশীল করাই হচ্ছে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য। সুতরাং আমাদের জাত্যভিমান পরিত্যাগ করে' নানা প্রাদেশিক জীবনে যে সেই স্রোতের ধারা অনুসন্ধান করা উচিত তা সকলেই স্বীকার করবেন।

আমাদের এই অহমিকা যে সত্যানুসন্ধানে বাধা জন্মায় তার দু'টি প্রমাণ উল্লেখ করব। একটী হচ্ছে হিন্দুস্তানী বা হিন্দীর স্থানে বাঙ্গালা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী, অন্যটি হচ্ছে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য প্রসারের জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা। কংগ্রেস হিন্দুস্তানী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে' স্বীকার করে' নিয়েছে, এবং নানা প্রদেশে সে-ভাষার প্রচলনে মনোনিবেশ করেছে। এই হিন্দুস্তানী ও হিন্দী বস্তুতঃ একই ভাষা। এ কথা মনে করা ভুল যে হিন্দুস্তানী হচ্ছে মুসলমানের ভাষা এবং হিন্দী হচ্ছে হিন্দুর ভাষা,—কংগ্রেস বিরোধীরাই এই রূপকথার সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে হিন্দুস্তানীই ভারতবর্ষের একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা, শুদ্ধ অশুদ্ধ এবং স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশ্রিতভাবে তা সমস্ত প্রদেশেই চলে, এবং প্রতি বাঙ্গালীই সে-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ না করেও বিদেশে চলনসই রকমে কাজ চালাতে পারে; হিন্দুস্তানী ভাষার এই প্রসার, কংগ্রেস তাকে স্বীকার করে' নেবার বহু পূর্ব্বেই ছিল, তাতে বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের কোন ক্ষতি হয় নি। সুতরাং সে-ভাষাকে আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার সুবিধার জন্য স্বীকার করে' নেওয়া হয়েছে

বলেই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নূতন বিপদ উপস্থিত হয়েছে এ-কথা বলা অসঙ্গত। বাঙ্গালী যদি সে-ভাষা শুদ্ধরূপে শিখতে বাধ্য হয় তাহলে তার নিজের ভাষাসম্পদই বৃদ্ধি পাবে বলে' মনে হয়।

অন্যান্য প্রদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের চেষ্টার পেছনেও রয়েছে আমাদের জাত্যভিমান। প্রবাসে বাঙ্গালী যাতে তার মাতৃভাষা অনুশীলনের সুযোগ পায়, সেদিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করব, এরূপ মনোভাবের কোন সার্থকতা নাই। কোন্ সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য, সে বিচার যারা গ্রহণ করবে তাদের, অন্যের নয়। বাংলা সাহিত্য যে অন্যান্য প্রদেশে প্রসার লাভ করে নি এ কথা মনে করবার কোন কারণ নাই। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রত্যেকের গ্রন্থাবলী হতে শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি ভারতের অনেক প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সেই সব প্রদেশের সাহিত্যিকগণ তা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্পদগুলি নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করবার প্রয়োজন বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, তা তাঁদের শিখিয়ে দিতে হয় নি।

আর একটি সমস্যা সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। দেশে এবং বিদেশে মানুষ বর্ত্তমানে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন, বাংলা দেশে শুধু যে হিন্দুর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে তা নয়, মুসলমানের অবস্থাও তদপেক্ষা ভাল নয়। তাঁরা সাময়িক উৎসাহের বশে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নন। দেশের এই সঙ্কটাবস্থা দেখে যাঁরা ব্যথিত তাঁদের অনেকের মতে এখন আর সাহিত্য ও শিল্প অনুশীলন করবার সময় নয়, দেশের দুর্দ্দশা দূরীভূত করবার জন্য চিন্তা করা আবশ্যক। স্থিরভাবে অনুধাবন করলে এ মতের অসারতা ধরা পড়ে। রুসো কিংবা ভল্‌টেয়ার রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন দার্শনিক এবং সাহিত্যিক। দেশে বিপ্লব আনয়ন করবার জন্য তাঁরা সাহিত্য রচনা করেন নি, অথচ তাঁদের চিন্তার দ্বারা সমগ্র ফরাসী জাতির মন যে-পরিমাণে আন্দোলিত হয়েছিল অন্যের দ্বারা তা হয় নি। যাঁদের সত্যকার সাহিত্য প্রেরণা থাকবে, যাঁদের দৃষ্টিশক্তি প্রসার এবং গভীরতা লাভ করবে, নিজেদের স্বভাব বশতঃ তাঁরা এমন সৃষ্টি করবেন যা হতে সমস্ত জাতি শক্তি আহরণ করবে, যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের মুক্তির পথ তারা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারবে। এ-জাতীয় সাহিত্যিক ভুঁইফোঁড়ের মত জন্মান না, দেশের সমস্ত সাহিত্য সাধনা থাকে তাঁদের পেছনে।

আপনাদের আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রবাসে প্রবাসীর কর্ত্তব্য অতি কঠোর, বিদেশে তাঁরা একটি বিশিষ্ট জাতির এবং সংস্কৃতির প্রতিনিধি। তাঁরা যেমন স্থানীয় সভ্যতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে' জাতীয় সংস্কৃতির প্রসারের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত করতে পারেন তেমনি অযথা জাত্যভিমানকে প্রশ্রয় দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির উপর স্থানীয় লোকের মনে অশ্রদ্ধার উদ্রেকও করতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা,—প্রবাসে তিনি হচ্ছেন কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রধান প্রতিনিধি।

পড়া

বুদ্ধদেব বসু

লোকে নানা কারণে বই পড়ে ; কেউ বা নেহাৎ সময় কাটাতে, কেউ বা আমোদ কি আনন্দের জন্য, কেউ বা লোককে এ-কথা বলবার জন্য যে অমুক-অমুক বই আমি পড়েছি। কেউ বা বই পড়েন, কেউ বা পড়েন লেখক। কারো সঙ্গে দশ মিনিট আলাপ করলে আপনি ইংরেজ, জর্মান, রুশ, ফরাসি, আইরিশ, আমেরিকান এত লেখকের নাম (আর কি অদ্ভুত সে-সব নামের উচ্চারণ!) শুনবেন যে আপনার মাথা ঘুরে যাবে ; কেউ আবার এক হাজার খুন জখম গোয়েন্দাগিরির গল্প পড়েছেন, কিন্তু কোনো লেখকের নাম তাঁর মনে দাগ কাটেনি, কাহিনীগুলিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অবলুপ্ত। এই দুইজনের মধ্যে কে বেশি অবাঞ্ছনীয়, তা বলা শক্ত ; কারণ একদিকে যেমন বলা যায় যে গোগ্রাসে রাশি-রাশি অসার বই গেলা সারাদিন তাস খেলার মতোই একটা বদ নেশা, তেমনি এ-ও ঠিক যে বইয়ের উপভোগ্যতার চাইতে লেখকের স্মনামের প্রতি যাঁদের ঝোঁক বেশি, তাঁরা নিজের আত্মশ্লাঘাকেই তৃপ্ত করেন, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহল সামান্য। বাকি থাকেন তাঁরা, যাঁরা আনন্দের জন্য বই পড়েন, এবং পাঠক হিসেবে তাঁরাই সার্থকতম।

কিন্তু বিবিধ প্রলোভনের ফাঁদ তাঁরাও যে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারেন তা নয়। প্রধান ফাঁদ হলো লেখকদের খ্যাতি। বুদ্ধিমান লোকের মধ্যে এমন পাঠকের সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব কম, যিনি জোর ক'রে নিজের উপভোগের পরিমাণকেই বইয়ের উৎকর্ষের মাত্রা ব'লে মানবেন। তাঁদের এ-মনোভাব উন্নাসিকতা কি বিনয় থেকে উদ্ভূত তা কে বলবে! পৃথিবী-বিখ্যাত কোনো লেখকের বই নিয়ে ব'সে যখন আপনার সত্যি-সত্যি ভালো লাগে না, যখন দু' পৃষ্ঠা প'ড়ে হাই ওঠে, এবং বই সরিয়ে রেখে ঘুমোতে ইচ্ছে করে, তখন—আপনি যদি অসাধারণ দাম্ভিক না হন—আপনি নিশ্চয়ই লেখকের খ্যাতি ভিত্তিহীন ব'লে সন্দেহ না ক'রে নিজের বোধশক্তিকেই অসম্পূর্ণ মনে করবেন। লেখক যখন নামজাদা, তখন বইখানা নিশ্চয়ই চমৎকার, এই রকম একটা মোহের বশবর্তী হ'য়ে নিজের কাছেও এ-ভাণ করা সম্ভব যে ও-বই পড়বার যে-বিরক্তি, আসলে সেটাই আনন্দ ; কিন্তু তার চেয়ে অকপটে এ-কথা স্বীকার করাই ভালো যে বইখানা ভালো লাগলো না, যদিও লেখকের মহিমা কোথায় তা হয়তো বুঝতে পারছি, কিংবা তাও পারছি না, আশা করি কিছুদিন পরে, সাহিত্যবিষয়ে আরো বেশি শিক্ষিত হ'লে, পারবো। কিন্তু নিজের কাছে না হোক্, পরের কাছে ও-কথা স্বীকার করবার সততা ও সাহস আমাদের অনেকেরই হয় না। এবং এই কারণে, পাঠক হিসেবে আমরা প্রায় সকলেই খানিকটা ভণ্ড ; বই থেকে পরিপূর্ণ উপভোগ আহরণ করতে অক্ষম।

ব্যাপারটি আরো একটু জটিল হয়েছে এই কারণে যে বিশ্বসাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ কীর্তিই আপাতত, শুধু আপাতত কেন, প্রকৃতপক্ষেই, একটু নীরস। এ-কথা কবিতা কি ছোটো গল্পের

চাইতে উপন্যাস সম্বন্ধেই বেশি প্রযুজ্য ; কারণ যে-গল্প পড়তে পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা লাগে তা একটু নীরস হ'লেও লেখকের উপর রাগ হয় না ; এবং অন্য সমস্ত সাহিত্যরূপ থেকে কবিতার (অন্তত আধুনিক কবিতার) স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে আকারে তা ক্ষুদ্রতম, খুব দীর্ঘ হ'লেও দুশো চারশো লাইনের বেশি গড়ায় না, এবং আট দশ চোদ্দ লাইনের মধ্যেও অমর কবিতা সম্ভব। বার-বার পড়া, এমন কি কিছু থেটে-খুটে পড়া অসম্ভব নয় ব'লে, দুরূহ কি আপাতনীরস হবার অধিকার কবিতার আছে ; কেন না একবার মর্মে প্রবেশ করতে পারলে সেই সামান্য ক্লান্তির হাজারগুণ পুরস্কার পাওয়া যায়। ভালো কবিতা যতবার পড়া যায়, ততবার নতুন লাগে, এবং তত বেশি ভালো লাগে ; কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা একই কবিতা অগুনতিবার পড়েন, এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আন্তরিক উপন্যাস-উৎসাহীদের মধ্যেও এমন লোক কম যিনি খুব প্রিয় নভেলটিও দু'বার পড়েছেন, উপন্যাসের বৃহৎ আকারই এখানে মস্ত বাধা। তাছাড়া, কাহিনীটি একবার জানা হয়ে গেলে কৌতূহলের উত্তেজনাও কমে' আসে, বেশির ভাগ উপন্যাস সম্বন্ধেই এ-কথা সত্য ; সুতরাং দ্বিতীয়বার পড়বার প্রেরণাও সহজে আসে না। উপন্যাসেরই, তাই, অতি সহজে ও অবিলম্বে উপভোগ্য হওয়া দরকার ; পাঁচশো পাতার বই, তাও যার মধ্যে হয়তো একশো পৃষ্ঠা উল্লেখযোগ্য, এবং বাকিগুলো জোড়া দেবার কলকব্জা, 'থেটে-খুটে' পড়া পেশাদার বিদ্বানের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ পাঠকের পক্ষে নয়।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে নীরসতা উপন্যাসেরই ব্যাধি—বিশেষতঃ ইংরেজি উপন্যাসের। উনিশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাসগুলির মধ্যে এমন বই দু'চারখানার বেশি মনে করতে পারবেন না, যার প্রথম শো খানেক পৃষ্ঠা পড়তে আপনাকে লগি ঠেলতে-ঠেলতে হাঁপিয়ে পড়তে হয়নি। প্রস্তাবনার মারপ্যাচ অতিক্রম ক'রে আসল গল্পটুকুর মধ্যে এসে পড়তে পারলে আর অবশ্য ভাবতে হয় না—কিন্তু অন্তরঙ্গতর পরিচয়ের অপেক্ষা না-রেখেই অনেক পাঠক যদি পলায়ন ক'রে থাকেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ফরাসি উপন্যাস এ-বিষয়ে অনেকটা ভালো ; আকারে অপেক্ষাকৃত ছোটো, এবং বর্ণনারও বাড়াবাড়ি নেই ; সাধারণত এমন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আরম্ভ হয় যে প্রথম লাইন পড়লেই আরো পড়তে ইচ্ছে করে। আধুনিক কালে ইংরেজি উপন্যাসেরও চেহারা ও চরিত্র কিছু বদ্‌লেছে—বদ্‌লেছে ফরাসিরই প্রভাবে।

এ-কথা অস্বীকার করতে চাওয়া বৃথা যে উপন্যাস পড়তে ব'সে আমরা সকলেই চাই যে গল্পটি তরতর ক'রে বলা হ'য়ে যাবে, লেখক আমাদের কান ধ'রে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবেন, থমকে দাঁড়াবার, প্রশ্ন করবার, সন্দেহ করবার সময় দেবেন না। ডিটেকটিভ উপন্যাস যখন সত্যি উৎরোয়, তখন এই গুণটিই তার মধ্যে বড়ো হ'য়ে দেখা দেয় ; আর গম্ভীর জাতের উপন্যাসকেও শেষ পর্য্যন্ত এর উপরেই নির্ভর করতে হয়। ডিকেন্স ও হার্ডিতে গল্প-বলার এই দুর্বার আবেগে ছাড়া আর কোনোখানেই মিল নেই ; টুর্গেনিভ কি আনাতোল ফ্রাঁসের গল্প অপেক্ষাকৃত ঢিমে লয়ে চলে, কিন্তু চলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এমন নিশ্চিত স্রোতে যে পাঠকের অন্যমনস্ক হবার উপায়ই থাকে না—এমন কি স্বয়ং টলষ্টয়, বিবিধ মহামূল্য মালে বোঝাই জাহাজের

অদ্বিতীয় নায়িক—তাঁর 'সংগ্রাম ও শান্তি-র' পথে দুরূহ যাত্রা করবার সাহস যদি আপনার থাকে, তাহ'লে গল্পের প্রচণ্ড টানে ঢেউয়ের ঝাঁকুনি খেতে-খেতে দেশ-দেশান্তর অনায়াসে পার হ'য়ে যাবেন—আপনার পক্ষে এ যে কী বিরাট ও বিচিত্র ভ্রমণ, বইখানা শেষ ক'রে তবে তা উপলব্ধি করবেন। এ ধরণের বই আরম্ভ করতেই যা সাহস দরকার, বাকি কাজ বইটিই করে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর সব বিখ্যাত উপন্যাসই এ-ধরণের নয়। যাঁদের নামে সবাই মাথা নিচু করে এমন অনেক লেখকেরই রচনাবলী পাঠকের ধৈর্যকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে। কোনো দুঃসাহসিক হয়তো বলতে পারেন যে যে-বই স্বতই উপভোগ্য নয়, সে-বই মহৎ হ'তে পারে না, কারণ উপভোগ্যতাতেই বইয়ের সার্থকতা। কিন্তু এখানে পাঠকের যোগ্যতার তারতম্যের, ও বিভিন্ন ব্যক্তিগত মেজাজের কথা ওঠে; অর্থাৎ যার যেমন ধাত, মর্জি ও শিক্ষা সে-হিসেবে প্রত্যেক পাঠকই নিজের প্রিয় লেখক বেছে নেন। তাহ'লেও এটা ঠিক যে সংলেখক, প্রথম থেকেই না হ'লেও শেষ পর্যন্ত, বেশির ভাগ পাঠককেই নিজের প্রভাবের মধ্যে আনেন; আবার এমন লেখকও আছেন যে-কোনো শ্রেণীর পাঠককেই যাঁর বই চেষ্ট ক'রে, এমন কি কষ্ট ক'রে পড়তে হয়, যদিও সমস্ত জগতেই তাঁদের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। নিজের কথা বলতে পারি, ফ্লোবেয়র যে একটু নীরস এ-ধারণা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না, আর প্রুস্ত্-এর বিখ্যাত গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ডটি তিনবারের চেষ্টায় শেষ করতে পেরেছিলুম। শুনতে পাই প্রুস্ত্ ফরাসি ভাষায় না-পড়লে ঠিক হজম করা যায় না, আর অনুবাদ ফ্লোবেয়র-এর যে কিছু ক্ষতি করেছে সে-কথা সহজ বুদ্ধিতেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইংরেজ লেখকদের মধ্যে জয়স, লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, এ তিনজনই কম-কি-বেশি দুষ্পাঠ্য। আমি স্বীকার করবো, 'ইউলিসিস' আগাগোড়া পড়া আমার সাধ্যে কুলোয়নি; লরেন্স-এর 'St Mawr,' কি 'Plumed Serpent' এত কঠিন চেষ্টা ক'রে পড়তে হয়েছিলো যে এখন দেখছি বই দুটির কোনো ছাপই আমার মনে পড়েনি; ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'The Waves' সম্বন্ধেও সেই কথা। এখানে ব'লে রাখি—যদিও না-বললেও চলে—যে এই লেখকত্রয়ের অন্যান্য গ্রন্থ আমাকে যে-আনন্দ দিয়েছে তা কোনোদিন ভোলবার নয়।

আমার বিশ্বাস এমন অনেক পাঠকই আছেন যাঁরা প্রুস্ত্ বা 'ইউলিসিস' পড়বার চেষ্টায় একাধিক-বার ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ এ-বিষয়েও নাকি সন্দেহ নেই যে আধুনিক ইউরোপিয় নভেলের উপর এ-দুটি গ্রন্থেরই গভীরতম প্রভাব। আমারই দোষ, সন্দেহ নেই। হয়তো আর পাঁচ কি দশ বছর পরে, এখন যে বিরাট কীর্তির সিংহদ্বারে ঢুকেই থমকে দাঁড়াই, সরাসরি একেবারে তার অন্তঃপুরে ঢুকে যেতে পারবো। কিন্তু যতদিন সহজেই সে-ক্ষমতা না আসে—মহৎ কীর্তি নিয়ে বসে' ঘর্মাক্ত হওয়া কি ভালো? না, সেটা ভালো না; কারণ যে-বই আমরা সত্যি-সত্যি উপভোগ করিনা, তা থেকে কিছুই আমরা আহরণ করতে পারিনে। বই পড়ে' লাভবান হ'তে হ'লে ভালো লাগাটাই প্রথম ও প্রধান সর্ত। এমন কি লেখার কলকৌশল শেখবার জন্যেও আমি শুধু সেই গ্রন্থেরই দ্বারস্থ হ'তে পারি, যেখানে আমার আনন্দ অবাধ ও অবারিত।

পাঠক হিসেবে আমি এখন তাই সতর্ক। যে-বই ভালো লাগে না, সে-বই অসমাপ্ত ফেলে রাখতে যেমন দ্বিধা করিনে, তেমনি নতুন-নতুন ক্ষেত্র থেকে আনন্দ আহরণের চেষ্টাতেও আমি পরাঙ্মুখ নই। অর্থাৎ, আমি এখন লেখক না-পড়ে' বই পড়তে ব্যগ্র। ছেলেবেলায় বড়ো নামের মোহ মনের মধ্যে ছিলো অতি প্রবল, সেই জন্যে সব লেখকই, এবং সব লেখকের সব বই-ই সমান ভালো লাগতো। সে ভালো লাগা বোধ হয় নবযৌবনের বিশ্বব্যাপী আনন্দেরই একটা মজরী; কারণ সত্যিই কি সব বই আমার ভালো লাগতো, না কি ভালো লাগছে ব'লে কল্পনা করতুম তা এখন বলতে পারবো না। তবে সব বই-ই শেষ পর্যন্ত পড়তুম, এবং শেষ ক'রে অনেকগুলো প্রশংসাত্মক বিশেষণ বন্ধুদের কাছে উচ্চারণ করতুম। মলাটের উপর নামটি বেশ বড়ো রকমের হ'লেই আর কথা ছিলো না। বন্ধুরা যদি কেউ বলতেন যে গল্‌স্‌ওআর্দি তাঁর ভালো লাগে না, কিংবা হামসুনের অমুক বইটি বাজে, তাহ'লে আমি মনে এমন কষ্ট পেতুম যেন আমারই ওটা ব্যক্তিগত অপমান। বেশ মনে আছে, রীতিমতো কষ্ট হ'লেও অনেক দীর্ঘ উপন্যাস আগাগোড়া পড়েছি—পড়েছি শুধু এই কারণে যে তা না-করলে লেখকের মানহানি হয়। কত দীর্ঘকাল ব'সে বইখানা তিনি লিখতে পারলেন, আর আমি এমন কি ব্যস্ত বড়োমানুষ যে শেষ পর্যন্ত পড়তেও পারবো না! কোনো বই আরম্ভ ক'রে শেষ নাকরাটা আমার বিবেচনায় ছিলো নীতিগর্হিত—তাছাড়া নিজেও সাহিত্যিক হ'বো এইরকম একটা ধারণা আমার মনে বাসা বেঁধেছিলো ব'লে সব লেখকের সঙ্গেই একটা ভ্রাতৃত্ববন্ধন অনুভব করতুম। কোনো সুনামসম্পন্ন লেখকেরই এতটুকু অবহেলা আমাকে দিয়ে সম্ভব হ'তো না। সুদ্ধ এই জ্ঞাতিত্ববোধের তাগিদে এমন অনেক বই শেষ করেছি, যা থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, শেষ করবার আনন্দটুকু ছাড়া আর-কিছুই পাইনি।

তাছাড়া, মুদ্রা-যন্ত্রের উন্নতি ও সুলভতা, এবং পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বইয়ের সংখ্যা, এমন কি, ভালো বইয়ের সংখ্যা, এত বেড়ে যাচ্ছে যে সঙ্গে-সঙ্গে বই বাছাই করবার কাজটিও নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং জটিল হ'য়ে উঠছে। অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রায় হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ি। জগতের যাবতীয় বিদ্যাই এখন আমাদের অধিগম্য, এবং অতি-লোভী মন যদিও প্রায় সমস্ত বিষয়েরই স্বাদ গ্রহণ করতে উন্মুখ, তবুও মানবজীবনের স্বল্পায়ুতা ও নিজের বোধশক্তির সংকীর্ণতার কথা ভেবে দু'একটি বিষয়েই মনকে আবদ্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু যে-কোনো একটি বিষয়েই কি বইয়ের সংখ্যা আজকাল কম! সে সমস্ত বই পড়তে গেলে বইয়ের জীবন্ত ক্যাটালগ হ'য়েই দিন কাটাতে হয়, এবং সেটা, আমার বিবেচনায়, খুব লোভনীয় অস্তিত্ব নয়। কথায়-কথায় অশ্রুতপূর্ব বইয়ের উল্লেখ ক'রে প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর ক'রে দেবার প্রলোভন থেকে যাঁরা মুক্ত, তাঁরা নতুন বইয়ের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার প্রয়াস কখনোই করেন না; কারণ তাঁরা জানেন যে এ-দৌড়ে, আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, অনতিপরেই তাঁরা অনেক পেছিয়ে পড়বেন—যদি না তাঁদের থাকে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ ও সেই অর্থ সম্ভূত অশেষ অবসর। কিন্তু এখানে আমি তাঁদের কথাই বলছি, যাঁদের এ-জগতে 'খেটে খেতে' হয়, এবং

পড়বার সময় তাঁদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তাঁরা যদি কোনো বই ভালো না-লাগলে ছেড়ে দেন, কিংবা যেটুকু ভালো লাগে সেটুকু বেছে-বেছে পড়েন তাহ'লে নৈতিক কোনো অপরাধ তাঁদের হয় ব'লে আমি মনে করিনে। বুদ্ধি থাকলে একটা বিষয়ের অল্প জেনেও বাকিটা অনুমান করা যায়; তাছাড়া, সকলেরই সব বিষয় জানবার দরকার করে না, এ-ও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ কথা। আসলে, বই পড়া ব্যাপারটা স্বভাবতই ও অবিমিশ্রভাবে বাঞ্ছনীয় কিনা, সে-বিষয়েও প্রশ্ন ওঠে, যখন দেখা যায় বই পড়তে-পড়তে কেউ-কেউ পাগল হ'য়ে যান, কেউ বা (এঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি) নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে সদ্যতম-পড়া লেখকের প্রতিধ্বনি হ'য়ে জীবন কাটান; কেউ আবার আঁদ্রে মোরোয়া বর্ণিত বালজাক-ভক্তের মতো কল্পনা-কাহিনীর সম্মোহনে বাস্তব জীবনের একেবারেই অযোগ্য হ'য়ে যান। যত বেশি পড়তে পারবো ততই আমার জিৎ, এ-রকম যাঁরা ভাবেন, অমুক-অমুক বই পড়েছি এ-কথা লোককে বলতে পারার তৃপ্তি ছাড়া অন্য কোনো তৃপ্তি তাঁরা পান কিনা সন্দেহ। বই যে আমাদের জীবনে এত প্রধান (যদিও সিনেমা ও রেডিওর দিগ্বিজয়ের পরে তার একচ্ছত্র রাজত্ব আর নেই) তার কারণই এই যে তা আমাদের অবসর সময়ে আনন্দ দেয়, এবং সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত করে, ভালো ক'রে বাঁচতে শেখায়। ভালো ক'রে বাঁচাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বই তার অন্যতম উপায়। এবং এটাই স্বাভাবিক যে আমরা যার-যার সুবিধেমতো উপায়ের ব্যবহার করবো, উপায়কে আমাদের ঘাড়ে চ'ড়ে ব'সে কর্তৃত্ব করতে দেবো না।

আলোকস্তম্ভ

জীবনানন্দ দাশ

১

কোথাও আলোকস্তম্ভ র'য়ে গেছে সমুদ্রের জলে।
নক্ষত্রেরা বিস্ময়ে বিভোর হয়ে আকাশের তলে
চেয়ে থাকে; স্তম্ভের প্রকোষ্ঠে রেখে প্রায়ান্ধ মানুষ
সাগরে অসংখ্য পোত চালায়ে নিতেছে দরায়ুস।
ধূসর গাধার পিঠে—তবুও গাধার থেকে ফিকে
মূর্খ এক ব'সে আছে শিষ্ট রূপসীকে
কোলে ক'রে। মনিষী ব্রহ্মাণ্ডে মাপে বিচ্ছেদের মানে।
আমাদের প্রেম, শান্তি, সৌন্দর্য্য এখানে।

২

এইখানে হেমন্তের অন্ধকারে তিত্তিরাজ গাছের ছায়ায় মনে হয়
পৃথিবীর নিচে সব অন্তরীণ ভূত কথা কয়:
'যত বড় হোক না ক' অন্ধকার, কাথ
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়।'
ভোর বেলা নগরীর বড় রৌদ্র হয়ে ওঠে অধিক বিশাল;
ভবঘুরে ভিড় তবু পদে পদে চাল
ভুল করে—নীলিমার নিচে ব'সে থেকে;—
যেন এই রক্ত, ভুল, গুণাগার সৃষ্টির কথা চিরকাল।
যতই বৃহৎ আরো হোক না ক' রসাতলে ভূতেদের রাত:
সৃজনের ঘুরুনিতে সেই একঘেয়েমির ধাত
নিজেকে নতুন করে;—সৃষ্টির দীর্ঘতম নীলিমার দিনে
আমাদের নগরীর ধোঁয়া শুধু সাড়ে তিন হাত।

অজ্ঞাতবাস

সমর সেন

টানা চোখ মদির অলস,
অকারণ দম্ভ ছাড়া প্রায়-শূন্য অন্তর,
হয়ত শারীরিক বুদ্ধি কখনো কখনো
চকিত ভঙ্গীতে সৌন্দর্য আনে।

তাছাড়া তোমাকে মনে পড়ে,
সম্মুখ সমরে হত।

আমি মাত্র
মেছুনীর সামনে সরস কেরাণী,
ফিরে যাই ঘরে ; ভাবি, এখনো সময় হয়নি ;
দেখি,
বিকেলের নদী নিবিকার নীল,
ধানক্ষেতে সন্ধ্যার সবুজ জমে,
মেঘলোকে অপরূপ রং।
কালের খোঞ্জা,
আশে পাশে শুনি পসারিণীর গান,
দিন শেষ হয়,
বিশাল শূন্যে কার করতালি বাজে,
অদৃশ্যে অট্টহাসি,
কোন্ দৈব রসিকের নিদারুণ পরিহাস
ছিন্নভিন্ন করে বাচাল অন্তর।
তুমি ধন্য, সম্মুখ সমরে হত।
দুর্দিনের আগে কী করে' জানাই,
পলায়ন জীবিকা,
পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন অসংখ্য প্রহারের

চতুর্দশপদী

বিষ্ণু দে

প্রণয় পালাল প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে।
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতাল-ফাটানো হাস্যে
বালির পাহাড়ে ধামা-চাপা গীতাভাষ্য
ক্ষ্যাপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি ?
জীর্ণ দেউলে বিদীর্ণ গম্বুজে কি ?

ঘর-ও-বাহির আপন-ও-পর পন্থা
আজকে শুধুই কূপমণ্ডুক গ্রন্থে।
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থাদলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচার আপন প্রাণ-বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেলে স্বার্থে শত্রুমিত্র॥

শেষ বুঝ

অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

প্রণমামি পাদপদ্মে ভবান-ভবিষ্য।
ভূতের কঙ্কাল স্মরি' অনর্থ হবিষ্য॥
বুভুক্ষার ব্যগ্রমুখে অগ্রে পিণ্ডদান।
শূন্য যদি স্ফীতোদর পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান॥
গতাসুর প্রেত ঘোরে গুহা-গর্ভলোকে।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিদ্যুত আলোকে॥

কয়েকটি চৈনিক কবিতা

কানাই সামন্ত

নির্বাসনে

ধবল শকুন্তপংক্তি ফুরে
কজ্জল তরংগচুড়ে-চুড়ে।
শ্যাম অরণ্যানি দেয় জ্বালি'
রক্তরাগ কুসুম দীপালি।
আরেক বসন্ত হয় গত
দূর নির্বাসনে পরাহত।

বলাকার ব্যাকুল পাখায়
গৃহমুখে চিত্ত মোর ধায়।

কবে লয় হবে অনুকূল,—
নেহারিব পুলক বিপুল
যেমনি গো মেলিব নয়ন
শৈলশ্রেণী বন-উপবন
দিগন্তরে পড়িছে লুটিয়া।

শিবগুরুশিখরে ছুটিয়া
নেহারিব। হায়!
আরেক বসন্ত চ'লে যায়।

—তু ফু (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক)

অনুরাগ

দলে দলে উড়ে গেছে পাখী।
মেঘমালা মিলায়েছে, কিছু নাই বাকি।
একা বসে' আছি, ঊর্ধ্বে ধবলীশিখর ওই জাগে।
শ্রান্তি নাই এই অনুরাগে।

—লি পো (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক)

প্রবাসে

মধুমতী-স্রোতেও করিছে বিরাজ
এই শুক্লনিশা আজ।

দেখ, হেথা চন্দ্রকরে স্বপন-চুমায়
অন্তরীপে নিস্তরংগ সাগর ঘুমায়।

কী ভাবে রয়েছে সেথা আত্মীয়স্বজন!···

বিজন প্রদোষে খনেক্ষণ
বন্য মরালের কণ্ঠে ওঠে সেই ডাক।
জনার ভুট্টার ক্ষেত দাঁড়ায়ে নির্ব্বাক।
অংগনে চাঁদের আলো ফুটে।···

একা বালাবধূ মোর গিরিপথে উঠে।

—তু ফু (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক)

সন্তান-ভাগ্যে

নবজাতকের লাগি বুদ্ধি ও প্রতিভা
স্বজনকাংখিত রাত্রিদিবা
বুদ্ধির বালাই লয়ে মরি—
দুঃখভোগ, সর্ব্বনাশ। এই কোরো, হরি,
মূঢ় আর মূর্খ হয় ছেলে।
তবে হেসে-খেলে
শান্তিপূর্ণ জীবনের সীমানায় এসে
রাজমন্ত্রী হবেই হবে সে।

—সু তাং পো (একাদশ শতক)

ইংরাজী থেকে অনূদিত

সহরতলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

তারপর সোজাসুজি যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, 'আমরা খারাপ লোক নই, আমাদের বিয়ে হয়েচে।'—

যশোদা বলিল, 'বিয়ে না হ'লে বুঝি লোক খারাপ হয়?'

মেয়েটি আবার ফিক্ করিয়া হাসিল, 'না, তা বলি নি। আপনি যদি কিছু সন্দেহ করেন, যদি ভাবেন আমরা পালিয়ে এসেছি বাড়ী থেকে, তাই জন্যে আগে থেকে বলে' রাখলাম। আমার দু'জনেই ছেলেমানুষ তো? আমরা এমনিভাবে এসে ঘরভাড়া নিতে চাইলে আপনার কেন, সব্বারি মনে হতে পারে ভেতরে কোন গোলমাল আছে নিশ্চয়। আপনিই বলুন, মনে হতে পারে না? গোলমাল অবিশ্যি আছে, তবে ও-ধরণের গোলমাল নয়। আমায় চুরি করার জন্যে ওঁর হাতে একদিন হাতকড়া পড়বে আর আপনাকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, ওসব ভয় করবেন না। গোলমালটা কি হয়েছে বলছি শুনুন। হয়েছে কি জানেন—'

মুখে যেন খই ফুটিতে থাকে মেয়েটির। যশোদা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। এতটুকু মেয়ে, বিবাহ নাকি হইয়াছে মোটে মাস ছয়েক আগে, কিন্তু কথায় একেবারে পাকা গিন্নি। কি তার মুখের ভঙ্গি, কি ভনিতা, কি ফোড়ন আর ব্যাখ্যা! শুনিতে শুনিতে যশোদার মনে হয়, কান্ন যেন অনুকরণ করিতেছে মেয়েটি, হাত নাড়া, ঠোঁট নাড়া, চোখের পলক ফেলা, রাগ দুঃখ ক্ষোভ বিস্ময় কৌতুক ফুটাইয়া তোলা আর মিলাইয়া দেওয়া সব যেন তার নকল, কথাগুলি শোনা-কথার পুনরাবৃত্তি। কে জানে মা না মাসী না পিসী কে নিজেকে এমনভাবে উজাড় করিয়া মেয়েটির মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে।

গোলমালটা অসাধারণ কিছু নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। দাদার পছন্দ-করা একটি মেয়েকে বাতিল করিয়া অপছন্দ-করা এই মেয়েটিকে বিবাহ করায়, বিবাহে নগদ টাকা নিতে রাজী না হওয়ায় এবং সম্প্রতি একটা কারখানায় পঁচিশ টাকায় প্রায় কুলিমজুরের একটা কাজ নেওয়ায় দাদা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। দাদার স্ত্রীর মতে, মায়ের পেটের ভাই তো দূরের কথা শত্রুও মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে না।—'আসলে, আমার জা-ই যত নষ্টের গোড়া। ক'দিন যা দেখেছি তাতেই বুঝেছি ভাসুর আমার ভাল লোক। আমায় দেখে ভাসুরের পছন্দ হয়েছিল, এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন উনি শুনেছেন, কিন্তু আমার জায়ের রঙটা আমার চেয়ে একটু কম ফর্সা কিনা, আর দেখতেও আমার মত সুন্দর নয় কিনা—তা, তার এখন বয়েস হয়েছে, ছেলে-

মেয়ে হয়েছে তিনটি, প্রথম বয়েসে যেমন ছিল এখনও কি তেমনি চেহারা থাকে, রূপ-যৌবন মানুষের দু'দিনে উবে যায়—আমায় দেখেই তাই অপছন্দ হয়ে গেল। তারপর যে মেয়েটিকে নিজে দেখে পছন্দ করল—ওগো, বলনা সে দেখতে কেমন ছিল? হাসছ যে? আমার খুব অহঙ্কার হয়েছে ভাবছ বুঝি? না বাপু, আমি ওসব অহঙ্কার বুঝি না, ন্যাকামিপনারও ধার ধারি না। সত্যি কথা বলব তাতে দোষ কি, তা সে নিজের সম্বন্ধেই হোক আর যার সম্বন্ধেই হোক। আমি তো আর বলিনি আমি আকাশের পরীর মত সুন্দরী! মোটামুটি দেখতে সুন্দর আমি, এই পর্য্যন্ত, বাস্। আমার মত সুন্দর মেয়ে গণ্ডা-গণ্ডা গড়াচ্ছে পথে ঘাটে। তুমিই তো বলেছিলে, সে মেয়েটা দেখতে কালো আর চোখ একটু ট্যারা, বলনি? যাক্‌গে, যা বলছিলাম, বলি। কি কথায় কি কথা এসে পড়ল। দেখুন তো দিদি, এমনি করে' পেছনে লাগলে কেউ কথা কইতে পারে? কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, সেই হ'ল আমার জায়ের রাগ। এমন ব্যবহার সুরু করল আমাদের সঙ্গে কি বলব। নগদ টাকা সম্বন্ধে বলতে লাগল, উনি যে নগদ নেননি সে কি আর ওমনি ওমনি—নগদ নিলে টাকাটা আমার ভাসুরের হাতে গিয়ে পড়ত, এ বেশ বৌ-এর গায়ে গয়না হ'ল! আমার পিসী,—পিসীই আমায় মানুষ করেছে, বড্ড ভালবাসে আমায়—পিসী নিজে থেকে আটশো টাকার গয়না বেশী দিয়ে দিল। গয়না যা দেবার তাতো দিলই, তার ওপরে আরও সাড়ে আটশো টাকার গয়না, নগদ টাকার বদলিতে। ভাসুর তিনশ' টাকা মাইনে পান, ও ক'টা টাকা নগদ পেলেই বা তিনি এমন কি বড়লোক হয়ে যেতেন, তিন মাসের মাইনেও নয়! কিন্তু জা' আমার ওই কথা বলে' বলে' ভাসুরের মন ভাঙতে লাগল। তারপর ও যেই চাকরীটা নিল,—না নিয়েই বা কি করবে বলুন, ভাল একটা চাকরীও জুটিয়ে দেবে না, এদিকে ঘরে বসে' থাকার জন্যও খোঁচাবে! ভাসুর নয়, আমার জা'। হাত খরচের দু'চারটে পয়সা তো মানুষের লাগে? দাদার কাছে গিয়ে চাইলে তিনি বলবেন, আহা বৌদির কাছ থেকে নে না গিয়ে। বৌদির কাছে চাইলে এমন করে' মুখ ঝাঁকাবে—! একবার দু'বার চেয়ে ও আর চাইত না। আমি একটা গয়না দিলাম বেচতে, তাও বেচবে না। এদিকে নস্যি কেনার একটা পয়সা নেই। তখন এই চাকরীটা নিয়ে নিল। কিন্তু আমার জায়ের সে কি রাগ! বলে কি, লোকের কাছে দাদার মাথা হেঁট করাবার জন্যে ইচ্ছে করে' এই চাকরী নিয়েছে। নইলে এতগুলো পাশ করে' কেউ কুলি-মজুরের কাজ নেয়! খেটে খেলে লোকের কাছে মাথা হেঁট হবার কি আছে বলুন তো দিদি? রাত্তিরে আমার জা' কি সব পরামর্শ দিল কে জানে, সকালে আমার ভাসুর ওকে বললেন কি, হয় এ-কাজ ছেড়ে দাও, নয় আমার বাড়ী থেকে বেরোও!' ফিক্ করিয়া সে আবার হাসিল, 'না, ঠিক ওমনিভাবে বলেন নি, তবে মোট কথাটা দাঁড়াল ওই। আমরাও তাই চলে' এলাম।'

ছেলেটির নাম অজিত, মেয়েটির নাম সুব্রতা।

'তোমার ডাকনাম কি বোন? সুব্রতা বলে' ডাকতে পারব না।

'আমার ডাকনাম নেই।'—সুব্রতা হাসে।

অজিত বলে, 'ওর ডাক নাম হ'ল গিয়ে—'

সুব্রতা চোখ পাকাইয়া বলে, 'দ্যাখো, ভাল হবে না কিন্তু!'

অজিত হাসিমুখেই চুপ করিয়া থাকে। তখন সুব্রতা বলে, 'আচ্ছা, বলো। কি আর হবে, আজ হোক কাল হোক জানতে তো পাবেন-ই!'

এই সামান্য হাসি-তামাসার ব্যাপারেও মনে হয়, অজিত যেন বৌ-এর বড় বাধ্য। সুব্রতার কৃত্রিম চোখ-পাকানো রাগকে পর্য্যন্ত সে সম্মান করিয়া চলে। প্রথমটা যশোদার একটু কেমন কেমন লাগিয়াছিল,তারপর দু'একটা দিন যাইতে না যাইতে সে টের পাইয়াছে, এটা দু'জনের একটা ভালবাসার খেলা মাত্র। দু'জনে বড় মজা পায় এ খেলায়। এই বয়সের দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে, মিলন যাদের হইয়াছে মোটে ছ'মাস আগে, এমন একটা আশ্চর্য্য মিল আছে মনের যে যেটুকু যশোদা বুঝিতে পারে তাতেই সে অবাক হইয়া যায়। সুব্রতা যদি আব্দার ধরে, আমায় আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও, আদর দিলেই বোঝা সময়ে অসময়ে যে আব্দার ধরে' স্বামীদের মেজাজ বিগড়ে দেয়, অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিচ্ছি পেড়ে। সুব্রতা জানে অজিত বুঝবে তার আব্দার শুধু আব্দার, সুব্রতার এই জানা অজিত জানে, অজিতের এই জানাও সুব্রতা জানে, আবার সুব্রতার—দু'জনের জানাজানির এই প্রক্রিয়া যশোদার মনে হয় অন্তহীন আর রহস্যময়, তবু যেন দু'জনের মধ্যেই এর সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা ঘটিয়াছে সহজ ও শান্ত আনন্দের গভীর অনুভূতিতে।

একেই কি বলে ভালবাসা? মনের মিল? যশোদা ভাবে।

হিংসার মত কি যেন একটা মৃদু প্রতিক্রিয়া জাগে যশোদার মনে, ক্ষীণ অস্বস্তিবোধের পীড়ন চলিতে থাকে। সুব্রতা তার ঘর সাজায়, সকালে আর সন্ধ্যায় অজিত তাকে সাহায্য করে। তিন টাকা ভাড়ায় যশোদা বড় ঘরখানাই তাদের দিয়াছে; একটি তোরঙ্গ আর দুটি সুটকেশে ঘরটা যেন খালি-খালি দেখায়। সুব্রতা দেয়ালে টাঙায় ছবি আর ফটো, আনালায় দেয় পর্দ্দা, অজিতকে দিয়া আল্না-আনায় আর বেশী-বেশী জামা-কাপড় অকারণে বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখে, যশোদার দেওয়া চৌকীর পায়া চারটিতে রঙীন কাপড়ের ঢাকনি দেয়, টুকিটাকি আরও কত কি যে সে করে। আর সেই সঙ্গে করে অজিতের সঙ্গে পরামর্শ—যশোদার সামনেই। মাঝে মাঝে যশোদারও মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাস নয়, বছর নয়, সমস্ত ভবিষ্যতকে সে যেন এই একটি ঘরে আটক করিয়াছে। এই ঘরেই তার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কোথায় টেবিল পাতিবে, কোন্‌দিকে আলমারি রাখিবে, ক'খানা আর কি ধরণের চেয়ার কিনিবে, এসব কল্পনার আর শেষ থাকে না। যে রেটে সে কল্পনায় আসবাব কিনিতে থাকে, তাতে এক বছর পরে এ-ঘরে তিল ধারণের স্থান থাকিবে কি করিয়া যশোদা ভাবিয়া পায় না।

কয়েকদিন রাঁধিয়া খাওয়ায় যশোদাই। তারপর একদিন দুপুরে সুব্রতা বলে, 'আমি কোথায় রাঁধব দিদি?'

'আমার রান্না রুচছে না?'

'ওমা, সে কি কথা গো! সত্যি বলছি দিদি, এমন রান্না জীবনে খাইনি কখনো। আজ যে কুমড়োর ছক্কা খাওয়ালে, ঠিক অমৃতের মত লাগলো। কুমড়োর ছক্কার যে আবার এমন স্বাদ হয়, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে কি জান দিদি, আমরা হলাম ভাড়াটে, চিরকাল তো আর তোমার ঘাড়ে খাওয়া উচিত হবে না।'

'আমার ঘাড়ে খাবে কেন বোন? তোমরা খরচা দিও, রান্না এক যাগাতেই হবে। চারটি তো প্রাণী আমরা বাড়ীতে, দু'যাগায় রেঁধে কোন লাভ আছে? মিছেমিছি বেশী খরচ।'

শুনিয়া সুব্রতা খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজী হয়। যশোদার প্রশংসা করিয়া বলে যে, বাস্তবিক, বয়স না হইলে কি এসব কথা মানুষের মাথায় আসে! কিন্তু একটা বিষয়ে আপত্তি করে সুব্রতা, সকাল সন্ধ্যায় চা-জলখাবার সম্বন্ধে।

'চা'টা কিন্তু আমি করব দিদি।'

'নিজের হাতে করে' খাওয়াতে চাও, না?' বলিয়া যশোদা হাসে।

সুব্রতার সঙ্গে এমনিভাবে আলাপ করে যশোদা, কখনো মা মাসীর মত, কখনও সমবয়সী সখির মত। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পরেই সব গোলমাল হইয়া যায়, সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে সমবয়সী বন্ধু মনে হয় তাকে, আর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে খেয়াল হয় যে সে ষোলবছরের একটা কচি মেয়ে মাত্র, যে বয়সের মেয়ে যশোদারও থাকিতে পারিত।

এরা যে তার ভাড়াটে একথা যশোদার মনেই থাকিতে চায় না। দু'জনকে তার মনে হয় অতিথি, তার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। এদের খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করা আর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব যেন তার। পরদিন সকালে চা আর সুজি করিয়া যশোদা ওদের ডাকিতে যায়। এ সময় রোজ সুব্রতা রান্নাঘরে উপস্থিত থাকে, আজ তাকে না দেখিয়া যশোদা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। ঘরে গিয়া যশোদা দ্যাখে কি, অজিত ছোট টুলটিতে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, চৌকীতে সতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া ওটানো তোষকে মুখ গুঁজিয়া সুব্রতা কাঁদিতেছে।

'কি হ'ল সকাল বেলা তোমাদের?'

'উনি গয়না বেচবেন।'

যশোদার সাড়া পাইয়াই সুব্রতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। জলভরা চোখ, ভিজা গাল আর ফুলানো ঠোঁটে কি ছেলেমানুষ আর সুন্দরই তাকে দেখায়! মনে হয় গিন্নিপনার অভ্যাসটাও যেন তার এখনকার মত ঘুচিয়া গিয়াছে। শিশুর মত যশোদার কাছে সে নালিশ জানায়।

'চায়ের জিনিষপত্র কিনবার পয়সা পর্য্যন্ত নেই দিদি। বললাম, ছ'গাছা করে' চুরি কেউ একহাতে পরে না, এমনি মোটা-মোটা চুড়ি, দু'গাছা চুড়ি বেচে দিয়ে এসো। তা, কিছুতেই বেচবে না। কি হয় বাড়তি চুড়ি বেচলে?'

'চায়ের জিনিষপত্র কেনার জন্য বৌ-এর গয়না বেচব!'—অজিত বলে।

'কেন, বৌ কি পর?'—সুব্রতা বলে।

কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। বৌ-এর গয়না বেচার সমস্যা যশোদার আগের ভাড়াটেদের মধ্যেও অনেকবার দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে-সমস্যা ছিল ঠিক উল্টা। গয়না বেচিতে স্বামীরাই ছিল উৎসুক, বৌরা ছিল বিরোধী। কলহও ছিল তাদের ভিন্ন ধরণের, কথা কাটাকাটি ছিল যেন গালাগালি আর অভিশাপ, মারামারির ভূমিকার মত। দু'একটি স্বামী যে বৌকে চড়-চাপড়টা বসাইয়া দিত না, তাও নয়। অতীতে স্বামী-স্ত্রীর যত কলহে সে মধ্যস্থতা করিয়াছে তার সঙ্গে এই নব দম্পতীর কলহের পার্থক্যটা এত বেশী স্পষ্ট হইয়া যশোদার কাছে ধরা পড়ে যে, এদের মিল ঘটানোর লাগসই উপায় সে ভাবিয়া পায় না। মিলনের চেয়ে মধুর সে বিরোধ, তার কি প্রতিবিধান আছে?

একরকম জোর করিয়া রান্নাঘরে ধরিয়া নিয়া গিয়া দু'জনকে সে চা আর সুজি খাওয়ায়। মন কাঁদিতে থাকে নন্দ আর সুবর্ণের জন্য। হয়তো এমনিভাবে কোথায় কার বাড়ীতে একটি ঘর ভাড়া নিয়া তারা আছে, পয়সার টানাটানির জন্যই হয়তো তাদেরও প্রথম ঝগড়া বাধিয়াছে এমনিভাবে। অল্পায়ের সুখ দুদিনে ঘুচিয়া গিয়া দুর্দ্দশার দু'জনের সীমা থাকিবে না, এই কথাই সর্ব্বদা সে ভাবে কিন্তু আসলে হয়তো এদের মতই দুর্লভ আনন্দে দিনগুলি তাদেরও ভরিয়া আছে! ভাবিতে গিয়া সংশয় জাগে যশোদার। সুবর্ণ তো সুব্রতার মত নয়! সুব্রতার গিন্নিপনা আছে পাকামি নাই, লজ্জাহীনতা আছে বেহায়াপনা নাই, বুদ্ধি আছে কুটিলতা নাই, চপল হাসি মন ভুলানোর অস্ত্র নয় সুব্রতার। সুব্রতার মত সুবর্ণ কি কাউকে আপন করিতে পারে, সুব্রতার মত মনের মিল কি সুবর্ণের সঙ্গেও কারো হয়?

অজিতের চা খাওয়া দেখিতে দেখিতে যশোদার মনে হয়, কে জানে! নন্দও তো অজিতের মত নয়। এদের দু'জনের বলিয়াই হয়তো ওদের মধ্যে এদের মত মিল হইয়াছে।

যশোদার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অজিত আর সুব্রতা ভাবে, তাদের চুড়ি বিক্রীর কথাটাই সে ভাবিতেছে। দু'জনেই যশোদার দিকে তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়, তারপর প্রায় একসঙ্গেই পরস্পরের দিকে মুখ ফিরানোর ফলে যেই চোখেচোখি হয়, দু'জনের মুখেই মৃদু হাসি ফুটিয়া ওঠে। যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটা আজও তাদের চোখে অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, এখনো বিস্ময় আর কৌতুক জাগে।

হাসি দেখিয়া যশোদা বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তোমরা।'

দু'জনে ভাবে, এ বুঝি যশোদার শরীর দেখিয়া হাসার জন্য তিরস্কার। লজ্জায় অজিতের চোখ মিট্ মিট্ করে, সুব্রতার গাল দুটী লাল হইয়া যায়।

যশোদা বলে, 'দুটো চুড়ি বেচবে কি বেচবে না, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটী কাঁদাকাটা কেন? তেমন দরকার হ'লে গয়না বেচতে কোন দোষ নেই—বেচাই বরং উচিত। মেয়েমানুষের গয়না তো শুধু সখের সামগ্রী নয়, বিপদে আপদে কাজে লাগবে বলেই গয়না গড়ানো, ও হ'ল একধরণের সঞ্চয়। তাই বলে' যখন-তখন সামান্য কারণে বেচতে নেই। চায়ের জিনিষপত্র কিনবার জন্যে

কি আর গয়না বেচা চলে? তবে মনে কর সুবুর—' সুব্রতার একটা কঠিন অসুখ বিসুখ হওয়ার কথাটা যশোদার জিভের ডগায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সামলাইয়া নিয়া সে বলে, 'ছেলেপিলে হবে বলে' টাকার দরকার, তখন তো আর বৌ-এর গয়না বেচব না বললে চলবে না। আমার কাছে ধার নাও ক'টা টাকা, পরে শোধ করে' দিও।'

সুব্রতার মুখের লালিমা আরও বেশী গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া থাকে। অজিত বলে, 'টাকা ধার করতে কেমন যেন লাগে।'

যশোদা সুব্রতার মুখখানা দেখিতে দেখিতে বলে, 'সে তো ভালই। তবে দিদি বলে' যখন ডাকো আমায়, নিশ্চয় শোধ করে' দেবে জানো মনে মনে, তখন ক'টা দিনের জন্য আমার কাছে নিতে দোষ নেই।'

অজিত কাজে চলিয়া যায়। সুব্রতা রান্নাঘরে আসিয়া যশোদাকে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করিবার সুযোগ খোঁজে আর কি একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া যায়। রান্না প্রায় সবই হইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল রান্না শেষ করা যশোদার চিরদিনের অভ্যাস, ভাড়াটেরা তার ন'টার মধ্যে খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত। মাঝখানে বাড়ীতে যখন কেউ ছিল না, শুধু সে আর ধনঞ্জয়, সে-কয়দিন রান্না বেলায় শেষ হইত। অজিত আসিবার পর আবার যশোদা ন'টার মধ্যে রান্না শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাল যে যশোদার বিশেষ লাগে তা নয়। মস্ত উনুনে কত লোকের রান্না সে একদিন রাঁধিত, বাড়ীতে দু'বেলা যেন চলিত নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা, এখন শুধু সিদ্ধ করা চারজনের ভাত।

'জানো দিদি—'

কিন্তু যশোদাকে কথাটা সুব্রতার আর বলা হয় না। কেদার আসিয়া বসিতে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কেদারের কাছে হঠাৎ তার এত লজ্জার কারণটা কেউ বুঝিতে পারে না।

'ভাড়াটেরা কেমন চাঁদের-মা?'

'মন্দ কি!'

'আরেক জোড়া ভাড়াটে আছে, আনব?'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কেন, এক জোড়ায় কলহ ঠেকানো যাবে না?'

ভাড়াটে আনিয়া দেওয়ার মধ্যে যে কেবল যশোদার কিছু উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করার মতলব তার ছিল না, অন্য উদ্দেশ্যও ছিল, যশোদার বুঝিতে বাকী থাকে নাই। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা এক বাড়ীতে থাকিলে লোকে যা-তা বলিবে বলিয়া কুমুদিনী আসিয়া তার কাছে থাকিতে চাহিয়াছিল, যশোদা রাজী না হওয়ায় রাগিয়া ঝগড়া করিয়া গিয়াছে। কেদার কখনো কথাটা আলোচনাও করে নাই যশোদার সঙ্গে, একেবারে ভাড়াটে আনিয়া দিয়া লোকের বলার পথ বন্ধ করিয়াছে।

কেদারও হাসিয়া বলে, 'তা কেন, রোজগারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে?'

'এদের মত ভদ্রলোক ভাড়াটে আনবে তো?'

প্রশ্ন শুনিয়া কেদার উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, এদের কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না চাঁদের-মা? না, তিনটাকা ভাড়ায় একখানা ঘর দিতে হয়েছে বলে' ভাবছ?

আমি কি সে সব না ভেবেই তোমায় ভাড়াটে এনে দিয়েছি! ক'টা মাস অপেক্ষা কর, অজিতের মাইনে ডবল হয়ে যাবে, তখন—'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলে, 'সেজন্য নয়। ভাবছি, শেষকালে কি ভদ্রলোক ভাড়াটেই শুধু রাখতে হবে আমার।'

'ভদ্রলোকের ওপোর তোমার এত রাগ কেন যশোদা?'

'ভদ্রলোকেরা কি মানুষ?'

আরেক জোড়া ভাড়াটে আনিবার অনুমতি যশোদা দেয়। এক জোড়া যখন আসিয়াছে, আরও আসুক। মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে থাকে যশোদার। মনে হয়, চলিতে চলিতে সামনে একটা বাধা পাইয়াছে বলিয়া নিজের মনের দুর্ব্বলতার জন্য সে যেন বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুপুরবেলা কুমুদিনী আসিয়া বেড়াইয়া গেল, সুব্রতার সঙ্গে ভাবও করিয়া গেল। ইতিমধ্যে যতবার সে আসিয়াছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যশোদার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে, বসিতে বলিলেও বসে নাই। আজ প্রায় সমস্তটা দুপুর এ বাড়ীতে কাটাইয়া গেল।

সুব্রতার কি হইয়াছে কে জানে, সমস্ত দুপুর কুমুদিনী যে এত কথা বলিল তার সঙ্গে, কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে তার এতটুকু গিন্নিপনা দেখা গেল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হইতে লাগিল তাকে।

কুমুদিনী চলিয়া যাওয়ার পর আবার সে উসখুস করিতে থাকে, সকালে রান্নাঘরে যেমন করিয়াছিল।

বলে, 'জানো দিদি, সেই যে বলছিলে না—'

যশোদা বলে, 'কি বলছিলাম?'

'সেই যে, যে জন্য গয়না বেচা চলে?'

কিছুক্ষণ যশোদা বুঝিতেই পারে না, অবাক হইয়া সুব্রতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর খেয়াল হয়।

'ওমা, সত্যি?' বলিয়া সুব্রতাকে সে বুকে টানিয়া নেয়।

রাত্রে ধনঞ্জয়কে খাইতে দিয়া সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যশোদার মনে হয়, আরেকজন মানুষকে খবরটা শুনাইতে না পারিলে বুকটা তার ফাটিয়া যাইবে।

'জানো, সুব্রতার ছেলেপিলে হবে।'

বাড়ীতে ভাড়াটে আসিবার পর ধনঞ্জয় কেমন মুসড়াইয়া গিয়াছে। ক'দিন চুপচাপ শুধু সকলকে দেখিয়া গিয়াছে, মুখে তার একটি কথা শোনা যায় নাই। যশোদার মুখে সুব্রতার সন্তান-সম্ভাবনার খবরটা শুনিয়া এবিষয়ে সে কিছুই বলে না, অভিমানী বালকের মত নিজের নালিশটা জানাইয়া বসে।

'তুমি যে বলেছিলে তোমার ঘরে শোব?'

'বলেছিলাম? আচ্ছা, আজ শুয়ো।'

ক্রমশঃ

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

আশা এবং আমি

জগদীশ গুপ্ত

পাশের বাড়ীর ষোড়শী কুমারী শ্রীমতী আশাকে আমি, শ্রীবিভূতি, একেবারে নিজস্ব করিয়া পাইতে চাই—বিবাহ হইতে পারে না, তবু চাই। ···বিবাহও ত' সেই ব্যাপারই! বিবাহ একটি নারী এবং একটি পুরুষকে পরস্পরের একেবারে নিজস্ব করিয়া পাওয়াইয়া দেয়।

আশা আমার প্রতিবেশিনী—

আর, খুব নিকটে সে বাস করে, কিন্তু কেবল ঐ অবারিত অবস্থিতির সুযোগই আমার এই পাইতে চাওয়ার কারণ নয়—কারণ তদতিরিক্ত এবং নিগূঢ়···

কারণ এই যে, আশার সঙ্গে দৃষ্টিতে দৃষ্টি সম্বদ্ধ হইয়া এবং পুনঃপুনঃ সপ্রীতি আর সম্মতিসূচক দৃষ্টি-বিনিময়ের পর আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত, ভবিষ্যৎ অন্তহীন ও প্রোজ্জ্বল, আর চিন্তারাজ্য সুসম্বদ্ধ ভাবগৌরবে অভূতপূর্ব্বভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে···

ভাবিয়া দেখিয়াছি, সামগ্রীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লওয়ার লোভ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি—মানুষের মনে চিরকাল তা' দুর্ব্বার হইয়া অবস্থান করে। ···শিশুর কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হয়: মায়ের পেটে ভাই কি বোন জন্মিলে তার প্রতি শিশুর ঈর্ষা কত! এত ঈর্ষা যে, অনিষ্টের ভয়ে লোকে সাবধান হয়। মা একেবারে নিজস্ব হইয়া ছিলেন; আর একজন আসিয়া সেই অধিকারে চ্যুত আর সেই আনন্দে বঞ্চিত করিবে, এই ভয়েই না শিশুর ঈর্ষা! মাতৃস্নেহের রস কি কি উপাদানে প্রস্তুত তা' জানি না; কিন্তু শিশুর মত নিজস্ব মায়ের কেউ নয় বলিয়াই শিশুর প্রতি মায়ের এত টান···

উদাহরণ আরো আছে—

এবং অনুভব সবাই করে যে, লোভের বস্তুর ভিতর মানুষের সেই সত্তা অদম্য হইয়া প্রবেশ করে, নানা দিকে প্রসারিত সত্তার যে অংশটুকু তার প্রিয়তম—যাকে সে কায়মনোবাক্যে লালন করিয়া সঞ্জীবিত, আর তুষ্ট তৃপ্ত সুখী করিতে চায়···না পাইলে মনে হয়, সত্তার শ্রেষ্ঠতম অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া, শূন্যে মিলাইয়া, জীবন ধারণের উপকরণ আর আকাঙ্ক্ষা ঠিক ততখানি নষ্ট হইয়া গেল।

এ-সংসার ভোজবাজি, মায়ার খেলা, দারা পুত্র পরিবার কেউ কারো নয়, ইত্যাদি খেদের মূলে আছে এই অনুভূতি যে, নিজস্ব কিছুই হয় নাই, সত্তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই, বঞ্চিত হইয়াছি—অতএব কেহ কাহারো নহে, আসল বস্তু কিছুই নাই। এই যন্ত্রণাকর বঞ্চনা আর হতাশার যারা মূল, অর্থাৎ দেখা যায় যারা নিজস্ব হয় না, তাহাদের কেবল পর নয়, পরিত্যাজ্য শত্রু মনে করিতে হইবে!

কিন্তু সাধারণতঃ কেউ তা' করে না—উপরন্তু নিজস্ব করিয়া পাওয়ার লোভ দমন করিতে না পারিয়া লোকে খুনোখুনি করে—বাধায় যুদ্ধ।

এই সব চিন্তা অকাট্য হইয়া আমার মনে জাগে—চিন্তাগুলিকে আমি ভালবাসি···

বিবাহ আমি করি নাই; কিন্তু জানি যে, বিবাহ অতিশয় ভদ্র, সামাজিক, এবং প্রচণ্ড রবে বিঘোষিত পবিত্র অনুষ্ঠান; কিন্তু ইহাও জানি যে, মূল ইচ্ছাটা ধর্ম্মপালন নয়, নিজস্ব করিয়া পাওয়ার। সবাই জানে যে, নিজস্ব করিবার উদ্যমের নামই প্রেমাকাঙ্ক্ষা, নিজস্ব হইয়া থাকার নামই দাম্পত্য ধর্ম্মপালন, এবং নিজস্ব করিয়া পাইবার পর আচরণের বাইরের পিঠ্‌টা মাজ্জিত রাখিতে পারিলেই লোকে দেখে, প্রণয় হইতে চ্যুতি নির্গত হইয়া স্বর্গাভিমুখে ছুটিতেছে···

কিন্তু তর্কাতীত অব্যর্থ কথা এই যে, আমার প্রতি অঙ্গের জন্য আমার প্রতি অঙ্গ কাঁদিতেছে। কেবল কাঁদিতেছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়—বলিতে হইবে যে, কান্নার সঙ্গে প্রতি অঙ্গ কাঁপিতেছে, তীক্ষ্ণ উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে, এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে···

আশাকে আমি ভালবাসি, যদি ভালবাসার নাম হয় তার দেহটাকে নিজস্ব করিয়া পাওয়ার ইচ্ছা। দৈহিকভাবে ধরা দিবার আগে মন ছোটে—মনে মন বাঁধা পড়িয়া দেহ হয় পদলুণ্ঠিত বা কণ্ঠলগ্ন। আশার মন আমি পাইয়াছি, আবিষ্কারের পর অধিকার করিয়াছি; কিন্তু নিরাকার মন কিছুমাত্র উপভোগ্য নয় যদি রূপময়, ভোগায়তন, আর সুখাবহ বস্তুগৌরবে গরীয়ান্ দেহ থাকে স্পর্শাতীত অনধিগম্য হইয়া···

সে বড় যন্ত্রণা।

মনে পড়ে জীবনের আগেকার কথা। বর্ত্তমানে আমার চিন্তারাজ্য সমৃদ্ধ বটে; কিন্তু ভৌতিক রাজ্য সমৃদ্ধ কোন কালেই ছিল না, এখনও নয়; তার মানে এই যে, চিরকালই আমি সামগ্রীহীন, বুভুক্ষু; নিজস্ব করিয়া আজ পর্য্যন্ত এমন কিছুই পাই নাই যার স্মৃতি স্মৃতির রাজ্য সমৃদ্ধ করিতে পারে, এমন কি উৎফুল্লকর হইতে পারে···

শৈশবের কথা মনে নাই—

শৈশবোত্তীর্ণ বয়সে খেলার সাথী মিলিয়াছিল—নিজস্ব সম্পদ হিসাবে তারা গণ্য হইলে অন্তরীক্ষ-বিহারী পক্ষীও আমাদের জীবনের সম্পদ। কৈশোরে পঠদ্দশায়—কই, কিছুই ত' মনে পড়ে না! এমন কোনো অতি সুন্দর দুর্লভ মূল্যবান সামগ্রী এমন অবিসম্বাদিতভাবে আমার অধিকারভুক্ত হইয়া যায় নাই যাহাকে স্মরণ করিলে মন সরস হয়।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরে প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইতে থাকে—মায়ের জন্য প্রকোষ্ঠ, পিতার জন্য, সহোদর সহোদরার জন্য, স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য, ইত্যাদি, বহু···

আমার অন্তরেও কতকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল—আর একটি প্রকোষ্ঠ গঠিত হইয়া উঠিল আশার

জন্য···অনুত্তরণীয়, অনবদ্য, নিভৃতির সুখে শিহরিত, মধুস্রাবী সে প্রকোষ্ঠ—সকল প্রকোষ্ঠের মধ্যমণি—

এই প্রকোষ্ঠে আশা বাস করিতেছে···

আমার সকল শিরার টান সেই দিকে, সকল অমৃত রস প্রবেশ করিতেছে সেখানে, আমার সকল জগৎ মদাক্রান্ত হইয়া অবিশ্রান্ত গুঞ্জন করিতেছে তাহাকেই ঘিরিয়া—

এবং আমার চিন্তারাজ্য ভাবগৌরবে আরো সমৃদ্ধ হইতেছে সেই উপলক্ষ্যেই···

পাপ পুণ্য বলিয়া সংসারে কিছু নাই। মানুষের সহজাত আর সঞ্চিতগত অপরিহার্য্য হইয়া পাপ পুণ্যের যে-বিচার চলিয়া আসিতেছে তাহা শোনা বা পড়া কথার ছাঁচে গড়া সংস্কার মাত্র। পাপ করিলে নরক, পুণ্য করিলে স্বর্গ; কিন্তু একটু চোখ খুলিলেই দেখা যাইবে যে স্বর্গ নরক ইহলোকেরই রূপান্তর ছাড়া কিছুই নয়। এমন হাস্যোদ্দীপক কল্পনা মানুষ কোন্ বুদ্ধিতে করিয়াছিল জানি না। নরকে প্রচণ্ড দুস্তর অগ্নি আছে, অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড, অগ্নিপ্রবাহ, অগ্নি-শলাকা আছে; কারণ, অগ্নির তাপ আমরা সহ্য করিতে পারি না। নরকে কণ্টক আছে, অঙ্কুশ আছে; কারণ, এগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর শরীরে বিঁধিলে এখানেও তা' যন্ত্রণাদায়ক।···তবে স্বীকার করি যে, কাহাকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো-প্রকার অধিকারে বঞ্চিত করিলে তাহাই হয় নিয়মভঙ্গের কাজ, সুতরাং আপত্তিজনক। কিন্তু আমি চিন্তাপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আশাকে যে-ব্যক্তি লোকাচার পালন করিয়া নিজস্ব করিয়া লইবে সে-ই করিবে নিয়মভঙ্গ, অর্থাৎ অধিকারে হস্তক্ষেপ; কারণ, আশার ইচ্ছা আমাকে পাওয়ার, এবং সেই কারণে আশার উপর আমার অধিকার জন্মিয়াছে। সতেজেই বলিতে পারি, আমার আত্মা তাহাকে চায়, তাহার আত্মা আমাকে চায়···

আত্মার নাকি ভগবানের বিভূতি বিরাজ করে···আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়, কিংবা আসামী হইয়া বিচারের পর দণ্ডভোগ করে! মিথ্যা কথা। যান্ত্রিক যে-ক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতম জটিলতম বিলয় বিকাশ উৎপত্তি রক্ষণ পুষ্টিশোধন সঞ্চালন ধ্বংস অবিরাম চলিতেছে, আত্মাও সেই বিস্ময়কর সচলকারী যন্ত্রেরই সৃষ্টি একটি পদার্থ—তা' এত সূক্ষ্ম স্নায়ুমষ্টি যে তার অবয়ব চোখে দেখা যায় না। কেবল মস্তিষ্ক কি হাত পা কি হৃদ্‌পিণ্ড দেহের বাহিরে যাইয়া যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না, ঠিক্ তেমনি পারে না আত্মা—মৃত্যুকালে সে বায়ুর মত কি পুত্তলিকার আকারে নির্গত হইয়া যায় না—জীবনবাহী অপরাপর যন্ত্রের মত তার, সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য স্নায়ুমষ্টিরও ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়···

এই যদি হয় ব্যাপার, তবে আত্মার অধোগমন, ঊর্দ্ধে প্রয়াণ, নরকস্থ হওয়া, স্বর্গবাস, যোনিভ্রমণের ক্লেশ, ইত্যাদি উত্তর ফল বা ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্ভাবনা রহিল কই!

কাজেই ও-সব ভয় করি না—

কেবল আকাঙ্ক্ষা করি আশাকে সশরীরে নিজস্ব করিয়া পাওয়ার।

অন্য একটা দিকে দৃষ্টি ফেলিলে দেখা যাইবে যে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার

দিয়া একান্ত আমারই জন্য পৃথিবীর যে-স্থানটুকু ছাড়িয়া দেওয়া আছে তা' সঙ্কীর্ণ—এত সঙ্কীর্ণ যে চলিতে ফিরিতে গায়ে ঘর্ষণ লাগে; বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে···

তারপর অধিকতর স্বচ্ছভাবে আরো চিন্তাশীল হইলে ইহাও অনুভূতিতে পরিষ্কার পরিস্ফুট হইয়া গেল যে, আশাকে পাইলে আমি বিচরণের যে ক্ষেত্র পাইব তাহার বিস্তৃতির সীমা নাই; আকাশে পাখীর উড্ডয়নের স্থান যেমন অসীম আমিও পাইব তেম্‌নি অসীমতা—উদ্দাম সঞ্চরণের অনন্ত অবকাশ আনন্দ আর স্থান।

আরো খানকতক পত্রবিনিময়ের পর আশাকে লইয়া আমি পলায়ন করিলাম···দূর শূন্য হইতে একাগ্র শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে-কপোতীর মাংস আমি প্রাণপণে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম তাহা আমার নিজস্ব হইল···আশা তাহার মাংসপুঞ্জ নৈবেদ্যের ফুলের মত লঘু আর ভক্তিপূত করিয়া আমার সেবার্থে নিবেদন করিয়া দিল···

আশা তেমন সুন্দরী নয়; তার প্রতি অপরিসীম পক্ষপাতিতা করিয়াও বলা চলে না যে, সে গৌরবর্ণা, আর তার নাক ভালো। আশার চোখের চাহনি যেন ঢিলে, একটু বিব্রত বিষণ্ণ ধরণের; কিন্তু হাসিলে তার চোখ ভারি মধুরভাবে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে; ঠোঁট দু'খানা লাল টুকটুকে—যখন কথা বলে তখন সাদা দাঁতের পৃষ্ঠপটে সেই কথার লহরী ধাক্কা খাইয়া অধরে যেন জ্যোতির্ম্ময় অমিয়ধারা ঝরিতে থাকে···

কিন্তু আমার চাহিদা হিসাবে রূপ তেমন বিবেচ্য নয়, যেমন বিবেচ্য একটি আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রীকে, যৌবনপুষ্ট সুস্থ নিটোল দেহটাকে, আমি নিজস্ব করিয়া কতখানি পাইলাম!····· হাস্যপূর্ব্বক স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেদিক দিয়া আশা আমাকে একবিন্দু অপরিতৃপ্ত রাখিল না—প্রথম দিনেই সে চমৎকার নিষ্ঠা আর শারীরিক প্রগল্‌ভ উৎসাহের সঙ্গে ধরা দিল··· আমার মাংসলোলুপ আর বহু দিনের ক্ষুধাপীড়িত মনের সে ক্ষিপ্ত উল্লাস আর উৎফেপের তাড়নায় পৃথিবী বেন শিবের তাণ্ডবে অন্ধকার হইয়া গেল—চৈতন্যে আগুন ধরিয়া গেল যেন···যেমন করিয়া ইক্ষুর রস মুচড়াইয়া বাহির করা হয় তেম্‌নি করিয়া জীবনের সবটুকু রস নিংড়াইয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। আশাও তৃপ্ত দানশীল হইয়া আমাকে মুহূর্ম্মুহু ঝলকে ঝলকে অমৃত পান করাইয়া অজ্ঞান সমাধির পর যেন অমরত্ব দান করিল।

কিন্তু আমার চিত্ত যে এমন অব্যবস্থিত তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। সকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম, রাত্রির জাগরণ আর অপরিমের উৎসবের পর সম্মুখে আতস-বাজির ছাই ছাড়া কিছু নাই, অর্থাৎ সকাল বেলা উঠিয়াই আশার দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইল, বহু পূর্ব্বেই জলন্ত ইন্ধনে ভস্মসাৎ হইয়া কতকাল যে এই নারী আমার সঙ্গে রহিয়াছে তাহা যেন মনে করিতেই পারি না···এ অতি পুরাতন; ইহাকে নিজস্ব করিবার উদ্দামতা একেবারে শান্ত

নিমজ্জিত হইয়া গেছে; এবং আমার নিজস্ব হইয়া আমাকে যা দান করিবার ছিল তাহা নিংড়াইয়া নিঃশেষে দান করিয়া এ নিঃস্ব অসার অপ্রয়োজনীয় হইয়া গেছে···

মনে হইতেই ভারি চমকিয়া উঠিলাম।

কৈফিয়ৎস্বরূপে বলিতে পারা যায়, দূরবর্ত্তিনী আশা যে-স্বপ্নের সৃষ্টি করিত সে-স্বপ্ন আর স্বপ্ন নয় এখন, জাগ্রত জগতের মূর্ত্তিমান ব্যাপার। বাতায়নে, সার্শির কাচের ওপিঠে দাঁড়াইয়া, অর্থাৎ একটা অজ্ঞাত লোক হইতে যে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া কল্পনার কারুকার্য্য-বিশিষ্ট অপ্সরীর মত আশা দুর্ব্বার হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিত, ইন্দ্রজালের সে চাতুরী, কারুকার্য্য, কুহেলিকা, আর চঞ্চল মায়া এখন বিতৃষ্ণাজনক আর কুত্রূপ স্থূল শরীরে সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গেছে···

নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু আমার মন আমি জানি; তা-ই ত' সব নয়!

সামগ্রীকে নিজস্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে কেমন স্বাভাবিক তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় পূর্ব্বেই ব্যক্ত এবং ব্যাখ্যা করিয়াছি; কিন্তু তখন বলি নাই যে, মানুষের মনের গতি স্বাভাবিক-ভাবেই যেমন জীর্ণ-সংস্কারের দিকে, তেমনি নূতনের দিকেও থাক—নিজস্ব করিয়া পাওয়ার মত, সামগ্রীকে পুরাতন মনে হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিত্য নূতন সামগ্রী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের কম প্রবল নয়। মনে মনে অবহিত হইয়া একটুখানি চেষ্টা করিলেই যে-কোনো ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, শৈশব হইতেই মানুষ নিত্য-নূতন পাওয়ার লোভে অস্থির আর অভ্যস্ত হইতে থাকে···

নূতন নূতন খেলনা পাইবার বায়না হইতে সুরু করিয়া পুরাতন বই টান্ মারিয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন বই কিনিবার আনন্দ আমাদের মনে নাই কি! ছেলেবেলাকার নূতন কাপড় পাওয়ার আনন্দ, নূতন কাপড় পরিলেই এখনো যেন জাগে।···অভ্যাসটা যায় না—থাকেই। সেই শৈশবাগত অভ্যাসের বশেই মানুষ বেশী দামী জিনিষ যা' অকেজো হয় নাই তার বদলে অল্প দামের নূতন জিনিষ আহরণ করিতে পারে; রং লাগাইয়া পুরাতনকে নূতন করে···

নূতন নূতন অলঙ্কারে আর বস্ত্রে পুরুষ নারীকে সজ্জিত করে নূতন বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত না হউক দমন করিবার অভিপ্রায়ে·····সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর প্রতি প্রণয় গাঢ়তর হয়, পুরুষ নূতন করিয়া আসক্ত হয়, স্ত্রীকে নূতন পরিবেশের অভ্যন্তরে নূতন রূপে পাইয়া।

ঐ কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া কেহ অস্বীকার করিলেই মিথ্যা হইয়া যাইবে না; কিন্তু আশা একদিনেই পুরাতন হইয়া উঠিবে, এবং তাহাকে লইয়া সীমাহীন উন্মুক্ত বিশ্ব-ভবনে বিহার আর বিচরণ করিবার উগ্র উষ্ণ দুর্দ্দাম ইচ্ছা একদিনেই এমন নিস্তেজ শীতল হইয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। ভাবিতে যখন পারিলাম তখন বিস্ময়ের সীমা রহিল না—আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এমনি অভ্যাসের দাস!

কিন্তু আশাও বড় বেশী গা-ঘেঁষা—স্পর্শ ত্যাগ করিতে সে কিছুতেই দিবে না—

আমার গা নড়িলেই যেন আঁৎকাইয়া ওঠে ; বলে,—ও কি, উঠ্‌ছ' যে ?

বলি : উঠ্‌ছিনে।

ঠেলিয়া যদি উঠিতে চাই তবে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলে,—কোথায় চল্‌লে ?

—এখানেই আছি, যাবো না কোথাও।

তারপর আশার আর্ত্ততা দেখিয়া নিবিড় একটা মমতা জন্মে ; ঢোক্ গিলিয়া বলি,—তোমাকে পেলাম, আশা !

আশা যেন ধন্য হইয়া যায়—

উদ্বেল আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া বলে,—আমিও তোমাকে পেলাম। তুমি আর আমি···

যেন দুনিয়ায় কোথাও আর এমন কেউ নাই যাহাকে আশা আর আমি চাই। আমরা দুটিতে মিলিয়া একটি সত্তা।

আশাকে আবার মিষ্ট লাগে—হটাৎ একটু যেন নূতন করিয়া তাহাকে পাই···

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশাকে লইয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বে আমার খুব প্রাণপ্রদ সতেজ উৎসাহের সহিত মনে হইত, এই বিপুল বিশ্বে স্বাধীন আনন্দে নৃত্য করিয়া বিচরণ করিব আশা আর আমি। সে-ও যে মনে মনে অত ব্যাপক আর প্রগাঢ় কল্পনা করিয়া বসিয়া আছে তাহা জানিতাম না।

তার মুখে "তুমি আর আমি" শুনিয়া ভারি মুগ্ধ হইলাম ; প্রেমের মন্ত্র-শক্তিতে স্থান কাল বস্তু পুনরায় সীমাহীন হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হইল ; এবং তার মুখের কথার মাধুরী মাখিয়া তার দেহ তৎক্ষণাৎ আমার চোখে মধুময় হইয়া উঠিল···

আশাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বলিলাম,—হ্যাঁ, আশা, তুমি আর আমি।

আশা আমার বুকের উপর মুখ রাখিয়া গা ঢালিয়া দিল।

বৈকালে বলিলাম,—আশা, চলো বেড়িয়ে আসি।

প্রস্তাবটা ভয়ঙ্কর বা উত্তেজনাপূর্ণ কিছু নয় ; কিন্তু আশা চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—কোথায় ?

—এই রাস্তায়।

—যদি তুমি হারিয়ে যাও ! বলিয়া আশা অত্যন্ত ভীত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

বলিলাম,—না, না, হারাবো কেন ? পাশাপাশি চল্‌ব' দু'জনে।

—চলো। বলিয়া আশা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া কিন্তু ভারি বিড়ম্বনায় পড়িলাম—বলিয়াছিলাম, দু'জনা পাশাপাশি চলিব, তাহা হইলেই হারাইবার ভয় থাকিবে না ; কিন্তু কাজেকর্ম্মে দেখিলাম, কেবল পাশাপাশি

চলিয়া আশা নিশ্চিন্ত নয়—সে আমার হাত ধরিতে চায়,—জামা চাপিয়া ধরিয়া আমাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে চায় !

তার হাত ছাড়াইয়া দিতে দিতে চলিলাম। বলিলাম,—হাত ধরো' না, জামাও ধরো' না। লোকে তাকিয়ে দেখে হাস্‌ছে যে !

আশা বলিল,—তা' হাসুক, হাস্‌ল' ত' বয়ে গেল। হারিয়ে গেলে এনে দেবে তারা ?

কথা কহিলাম না।

নিঃশব্দে চলিতে চলিতে এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি ত' তাকিয়ে কিছুই দেখ্‌ছ না, আশা ! কত নতুন নতুন, ভাল ভাল জিনিস রাস্তার দু'ধারে ! ঘন ঘন আমার মুখের দিকে দেখ্‌ছ' কি ?

—দেখ্‌ছি বই কি দোকানের জিনিস। কিছু জিজ্ঞাসা করছিনে, তুমি যদি বিরক্ত হও !

—কিছু নেবে না ?

—কি নেব ?

—কত জিনিস কত দোকানে ! কিছু কিন্‌তে ইচ্ছে হয় ত' বলো।

—উঁ হুঁ। তুমি আরো সরে' এস আমার কাছে—আমাদের ভেতর দিয়ে কাউকে যেতে দিও না—আমার ভারি গোলমাল লাগে। এত লোক এখানে !

আশার ইচ্ছা পালন করিলাম—তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিলাম, এবং এখানকার লোক সংখ্যায় এত কেন, এ-বিস্ময়ের জবাব দিলাম না···আর অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার চিন্তারাজ্যের বিস্তৃতি সার্ব্বভৌম পর্য্যায়ে উঠিয়া পুনরায় ভাবগৌরবে সমৃদ্ধ হইতেছে।

বুঝিতে পারিলাম যে, দেহকে নিজস্ব করিয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিকেও উপভোগ্য মনে না হইলে, আর বুদ্ধিকেও বশবর্ত্তিনী করিয়া তুলিতে না পারিলে সম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে না। প্রেম সংলগ্ন করিয়া রাখে সত্যই, সে সাধ্য তার আছে। কিন্তু ইহাও একটি সত্য যে, মিলনে বিরহে প্রেমের প্রকাশ যতই হৃদ্য হউক, সেই প্রকাশে অভিনবত্ব দেয় বুদ্ধি, দেহ নয়। যার বুদ্ধি নাই সে পুত্তলিকার মত একঘেয়ে। মানুষকে নিত্যই নূতন করিয়া তোলে তার বুদ্ধির দীপ্তি—বুদ্ধির দীপ্তিতেই ঘটে অপূর্ব্বত্ব আর রূপান্তর ; অপূর্ব্ব রূপান্তর দেখিয়া জাগে বিস্ময়, আর নিমেষে নিমেষে নূতন করিয়া পাওয়ার উল্লাস···তার কৌতুক আর সত্তা ঝক্‌মক্ করে বুদ্ধির দীপ্তিতেই, আসে রসজ্ঞান, এবং আলাপ পরিবেশিত হয় রসপূর্ণ হইয়া।

আরো বুঝিলাম যে, পৃথিবী এখনো নীরস হইয়া পুরুষের পক্ষে বাসের অযোগ্য হয় নাই নারীর ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে বলিয়া, আর, বুদ্ধি দিয়া নিজেকে সে সতর্ক শাণিত স্বতন্ত্র আর সজ্জিত রাখে বলিয়া।

কিন্তু আশার কেবল দেহই আছে, আর কিছুই নাই। খালি দেহকে অবলম্বন করিয়া মানুষ তিষ্ঠিতে পারে কতক্ষণ !

আশাকে লইয়া পথে পথে প্রমোদ-ভ্রমণ শেষ হইল ; এবং তাহাকে লইয়া যখন আমি

বাসস্থানে ফিরিলাম তখন মনে মনে আমি তাহাকে চৌদ্দ আনা ত্যাগ করিয়াছি……উড্ডয়নশীল মন ভারাক্রান্ত হইয়া পাখা গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে; পৃথিবীকে আশার দেহের সৌষ্ঠবে নবীন আর শ্রীযুক্ত, আর দেহের আলোকে উৎফুল্ল উজ্জ্বল অন্তহীন আকাশ মনে হইতেছে না।

তখন আশাকে মনে হইতেছে পিঞ্জর, আর নিজেকে মনে হইতেছে সেই পিঞ্জরে বন্দী।

কাল রাত্রে বসিয়া বসিয়া শুইয়া শুইয়া আশার সঙ্গে যত গল্প করিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা কোনোদিনই করিতে পারিব না…… নেশার ঘোরে সেই অনর্গল আলাপ, আর আশার অর্দ্ধোচ্চারিত কথা, এত মধুর, এমন নূতন, এম্‌নি প্রাণময় মনে হইয়াছিল যে, নিজেরই দিক ঠিক রাখিতে পারি নাই—কৃতার্থতায় আর তৃপ্তিতে একশোবার মনে হইয়াছিল, পৃথিবীতে যদি কেহ সুখী থাকে তবে সে আমি…

কিন্তু আজই, একটি অহোরাত্রেই, পৃথিবী যেন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া একটি জনমানবহীন শুষ্ক প্রান্তর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল—

মনে হইল, ভুল করিয়াছি…

ভাবিয়াছিলাম, আশাকে লইয়া সংসারের বৃন্তচ্যুত হইতে পারিলেই নিঃশ্বাসরোধকর সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর হইতে মুক্তি পাইয়া অসীম নভোমণ্ডলের অধিবাসী হইব; কিন্তু এখন মনে হইতে লাগিল, এই জীবনই সঙ্কীর্ণ—এত সঙ্কীর্ণ যে মুখখানা রাখিবার স্থান নাই। সেই জীবনই ছিল অবাধ অসঙ্কোচ প্রযুক্ত—কেহ কোনোদিন বলপূর্ব্বক টানিয়া নামায় নাই; বলে নাই, এই গণ্ডীর ভিতর তুমি থাকো……

—কি ভাব্‌ছ? আশা জিজ্ঞাসা করিল—অনুকম্পার সুরটি অনুভব করিলাম।

বলিলাম,—ভাব্‌ছিনে কিছু, আশা। তুমি কি ভাবছিলে এতক্ষণ চুপ করে'?

আশা কথা কহিল না—

দেখিলাম, চোখে তার জল আসিয়াছে……

—বলো, কি ভাব্‌ছ!

—মায়ের কথা। বলিয়াই আশা আমার ডান হাতখানা দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, বটু আর মণির কথাও ভাবছি। তুমি তাদের কথা ভাবছ না?

আশা বিধবা মায়ের জ্যেষ্ঠা সন্তান; বটু আর মণি তার ছোট দু'টি ভাই। এই নিঃস্ব বিধবাকে আর্থিক সাহায্য করেন তাঁর দেবর—আশার বাবার খুড়্‌তুতো ভাই।

আমি তাহাদের কথা ভাবি নাই—কাহারো কথাই ভাবি নাই—উন্মত্ত হইয়া কেবল ভাবিয়াছিলাম আশার কথা, আর তার প্রণয়ী স্বরূপে নিজের কথা……

কিন্তু এখন তাহাদের কথা মনে পড়িল—নিঃশঙ্ক পরিপাটি তাদের পারিবারিক জীবন—ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরেই তারা অম্লান স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিচরণ করে; তারাও ছিল আমার জীবনকে প্রসারিত স্নিগ্ধ করিবার সামগ্রী……

আশা তার মা আর বটু আর মণির সহিত যোগদান করিয়াই আমার জীবন-প্রদীপ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিত—

তা' মনে পড়িল, আর নিঃশ্বাস পড়িল।

কিন্তু আশাকে নিজস্ব করিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে রসবাহী নাড়ীর যোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছি……আত্মার আলিঙ্গনের মধ্যে, আর আত্মাকে ক্রীড়াশীল করিয়া অসীমের দিকে তরঙ্গায়িত করিতে আপনার জন বলিতে যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সবাইকে ত্যাগ করিয়া বৃক্ষজননীর আশ্রয়ভ্রষ্ট ফলের মত অধোগামী হইয়াছি—কোথায় যাইয়া পড়িব তাহা কল্পনা করিতেও পারি না……

আশা চোখ মুছিল—

বলিল,—তুমি আমাকে ফেলে পালাবে না ত'!

শুনিয়া সত্যই আহত হইলাম—

বলিলাম,—না, আশা; সে-ভয় কেন করছ?

পলায়ন করিবার কথা একেবারেই ভাবি নাই এমন নয়; কিন্তু এ-সত্য যে অনিবার্য্য, আশা ভিন্ন আমার মুক্তির পথ নাই; যদি ঘরে ফিরিতে হয় তবে আশাকে লইয়াই ফিরিতে হইবে, অথবা মরিতে হইবে—পথে পথে প্রেতের মত আমি বেড়াইতে পারিব না, আশাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও জন্মভূমিতে আমার স্থান নাই……

কেউ যেন বাঁধন কষিতেছিল; কষিতে কষিতে হঠাৎ ছাড়িয়া দিল—নিষ্কৃতি পাইয়া গেলাম—

আনন্দে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আশাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিলাম, তার দেহকে নয়, দেহের অবলম্বনে আর স্পর্শে তার আত্মাকে—সেখানেই শান্তির একটা শুদ্ধ রূপ চোখে পড়িল……

বলিলাম,—তুমি মায়ের কাছে যেতে চাও, আশা?

শুনিয়া আশা ভয়ে যেন শুকাইয়া উঠিল; বলিল,—কিন্তু তুমি?

বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল—

আশা একমাত্র আমাকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য, অত্যাজ্য আর উপাস্য করিয়া রাখিয়াছে। মন গলিয়া যেন কণ্ঠ অবধি হিল্লোলিত হইয়া উঠিল…

আশার বুদ্ধি নাই, রূপ নাই; কিন্তু ভুল নাই যে, সে আমারই ভিতর নিজেকে নিমজ্জিত মিশ্রিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—তার নির্ম্মল প্রাণের এই সুকোমল স্বাদুতা আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল…

বলিলাম,—আমিও যাব।

—তা কি হয়?

—হয়, আশা; বিয়ে করলেই হয়।

—তা' কেমন করে' হবে! আমরা যে এক জা'ত নই।

—তা' না-ই বা হ'লাম!

—তবে তা'-ই করো।

সে রাত্রে আশা অসীম মুক্তির মাঝে নূতনতর রূপ ধারণ করিয়া আবার আমার নিজস্ব হইল।

সামাজিক বাস্তববাদের নূতন ভিত্তি

যামিনীকান্ত সেন

ম্যাথ্ আর্নল্ড্ এক জায়গায় বলেছেন যে ইউরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে civilization of the exterior. অর্থাৎ এ-সভ্যতা বহিরঙ্গ ব্যাপার। যতক্ষণ বহিরঙ্গে কোন খুঁত থাকবে না ততক্ষণ এ-সভ্যতার পেছনকার বা ভিতরকার কোন সৃষ্টির ভিতরে কেউ দেখ্‌তে উৎসাহিত হয় না। কাজেই বাইরের চাক্‌চিক্য, পারিপাট্য ও পরিপূর্ণতাই এ-সভ্যতার আলোচনার ব্যাপার—ভিতরের অসারতা, পঙ্কিলতা এমন কি রিক্তিমতাও এ সভ্যতা চোখ তুলে চায় না। সাহিত্যে ও কলায় এ জন্য চাওয়া হয় 'composition'-এর অক্ষত পরিপূর্ণতা, ভিতরকার জটিলতা কেউ খুঁজ্‌তে চায় না।

এ জন্য আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদের লক্ষ্য হয়েছে বাহিরকে প্রভাবিত করা এ-সমস্তের শালীনতা ও পারিপাট্যে। প্রকাশ্যে কেউ অসম্বৃতভাবে বা অপ্রস্তুতভাবে উপস্থিত হয় না। প্রভু-ভৃত্য, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই সুসজ্জিত ও প্রস্তুত হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। কেউ নগ্নদেহে বা অর্দ্ধসম্বৃত বস্ত্রে কারও সাম্‌নে যায় না—নিজের শরীর মার্জ্জন বা প্রসাধন প্রভৃতি কাজ নেপথ্যেই করা হয়। এর ভিতর অর্দ্ধসমাপ্ত, অসমাপ্ত ও ঢিলে-ঢালা ব্যাপারের অবসর নেই।

ইউরোপের এই মনোভাবের পেছনে আছে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বহিরঙ্গ আচারের দান। বিখ্যাত আলোচক Pater রেনেসাঁ সম্বন্ধে ভাব গদগদ হয়ে বলেন যে, এই বিপর্য্যয় ভিতরের রহস্য ও গুপ্ত তথ্যের দোহাই দেয় নি—স্বর্গের অজানা ও অদৃষ্টের হেরফেরের খাতিরে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়জ লালিত্যের কণাও বর্জ্জন করে নি। ভিনাসের পরিপূর্ণ ও অটুট অঙ্গই হয়েছে এই মনোবৃত্তির শেষ-বাণী ও চরম বাইবেল। এতেই খুঁজতে হবে অধ্যাত্ম তথ্য—তার বাইরে কোন তথ্য নেই। এ জন্য গ্রীক দেবতাদের শরীরের হুবহু পরিপূর্ণতা ও ইন্দ্রিয়জ লালিত্য অতুলনীয় হয়েছে। বরং গ্রীক সভ্যতার পেছনে ধর্ম্মভাব ছিল—রোমক সভ্যতা সে-ভাবও বর্জ্জন করে। রোমক দেবদেবীরা হয়ে দাঁড়ায় ঘর সাজাবার সুন্দর মূর্ত্তি—তা ছাড়া আর কোন সার্থকতা তাদের থাকে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী medeival যুগে এ রকম ছিল না। তখন গ্রীকের মূর্ত্তিগুলিকে বহিরঙ্গমূলক করা হয় নি। ক্যাটাকুম্ব্‌স-এ (catacombs) ও প্রাচীন cathedral-এ যেসব প্রাচীন খ্রীষ্টমূর্ত্তি পাওয়া যায় সেগুলিকে করা হয়েছে জীর্ণশীর্ণ ও বিষণ্ণ, যাতে করে' সে-সব মূর্ত্তির ইন্দ্রিয়জ লালিত্য কা'কেও না আকর্ষণ করে। বাইবেল বলেন "Flesh is Death, spirit is Life" কাজেই মাংসের আকর্ষণ নির্ব্বাসিত করে' কৃত্রিমভাবে রুগ্ন ও বিষণ্ণ মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে এক রকমে তথাকথিত অধ্যাত্মবোধ চালান হয়। Chartres Cathedral-এ যীশুমূর্ত্তির নিম্নভাগ মোটেই সুগঠিত নয়। বস্তুতঃ তখনকার ইউরোপীয় সভ্যতা বহিরঙ্গ ছিল না। এ সব অর্দ্ধসমাপ্ত, অপূর্ণ, শিথিল ও রুক্ষ মূর্ত্তিগুলির ভিতর দিয়ে ইউরোপ ধর্ম্মের জটিল অরণ্যে ঢুকতে চেষ্টা করেছে—বহিরঙ্গ দৃষ্টি ভেঙে। দান্তের কাব্যেও এ রকমের অসম্বৃত রুক্ষতা ও এলোমেলো ভীতিজনক ব্যাপারের সন্নিবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

এর মূলে ছিল আত্মসমর্পনের ভাব ও যথার্থ ভক্তিবাদ। মায়ের নিকট ছেলে যদি সেজেগুজে না যায় তা'তে মায়ের স্নেহ কমে না; ভগবানের নিকট ভক্ত যখন নিজেকে দান করে তখন রঙ্গমঞ্চসুলভ অভিনয় করে' অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এজন্য রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে অসম্বৃতভাবে আত্মনিবেদনের প্রথা ছিল। পরবর্ত্তী যুগে এসেছে সুসজ্জার আদর্শ। তখন গির্জ্জায় পরিপাটি হাল-ফ্যাসানের কাপড় পরে' যাওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত এ সবের লক্ষ্য যে শুধু খ্রীষ্ট ছিলেন তা নয়—চারিদিকের সমাজ ও লোকবাহুল্যের সহস্র চক্ষু।

ধীরে-ধীরে ইউরোপের এই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। তখন Goethe যাকে বার বার 'Ehrfurcht' বা শ্রদ্ধা বলেছেন তা চলে' যায়। প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা চলে' যায় এবং সকল সম্পর্কই দাঁড়ায় একটা অধিকারবাদের বা 'doctrine of right'-এর উপর। ফরাসীবিপ্লব এই মনোভাবের মূলে ইন্ধন যোগ করে সন্দেহ নেই। এর পরে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক যুগ এই ভাবটিকে আরও দৃঢ় করে।

রাজা যখন নিজের কর্ত্তব্য না করেছেন এবং প্রজার অধিকার অস্বীকার করেছেন তখন তাঁ'কে ছিন্নমুণ্ড হ'তে হয়েছে ফরাসীদেশে ও ইংলণ্ডে। স্বামী বা স্ত্রী যদি পরস্পরের অধিকার স্বীকার করে' নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন না করে তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ভিতর Herbert Spencer ও Darwin-এর বিবর্ত্তনবাদের মূলে যে struggle for existence এবং survival of the fittest-এর কল্পনা আছে তা কাজ করেছে সামান্য নয়। কারণ এ-রকমের সংগ্রামই হয়েছে ইউরোপীয় সামাজিক বাস্তববাদের ভিত্তি। এর ভিতর আত্মসমর্পনের স্থান নেই—শক্তি বা সংগ্রামে পরস্পরকে আহত করে' নিজে জয়যুক্ত হওয়াই হ'ল এর লক্ষ্য। এজন্য ইউরোপের প্রতিপক্ষ অহরহ প্রস্তুত এবং সামাজিকতার ক্ষেত্রে কেউ নিজের দুর্ব্বলতাকে দেখাতে প্রস্তুত নয়। বাইরে ভড়ং করা অনিবার্য্য হয়েছে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাতে ও কাবু করতে। এর মূলে যে অন্তরঙ্গ বঞ্চনা আছে তা বহিরঙ্গ সভ্যতা দেখে না। এজন্য Hitler বড়াই করে' বল্‌ছে, তার নিকট যা অস্ত্র আছে তা' দুনিয়াকে জর্জ্জরিত ও পরাভূত করবে। অপরপক্ষও বলছে তাদের ধনবল ও জনবল অসামান্য। বাইরে থেকে টের পাওয়া মুস্কিল অথচ হয়ত এক নিঃশ্বাসে প্রতিপক্ষ তাসের ঘরের মত ভূমিসাৎ হ'তে পারে। এ-যুগ কিন্তু বহিরঙ্গ পারিপাট্য পুরামাত্রায় চালাচ্ছে publicity campaign-এর সাহায্যে। যা নয় তাকে হাঁ বলা হচ্ছে—সমগ্র পৃথিবীতে তার ছড়ান হচ্ছে। এর ভিতরে আছে প্রতারণা ও মিথ্যাবাদ—অথচ সে-প্রশ্ন একবারও উঠছে না।

এ দেশেও বহিরঙ্গ সভ্যতাকে যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে' ইউরোপ হ'তে আমদানি করা হয়েছে। কারণ এটা এখানকার মাটিতে জন্মায়নি। ফলে হয়েছে এক অপরূপ বিভ্রাট। কটিবাস পরিহিত চাষা বা বামুন পণ্ডিত—আপাদমস্তক বসনাবৃত জনতা, শিথিল ঢিলে-পোষাক-পরা, অমার্জ্জিতকেশ ব্যক্তি এবং সুশোভন মার্জ্জিত বস্ত্র ভদ্রব্যক্তি—সব রকমেরই নমুনা সমাজের চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত কেউ মনে করছেন পূজোর সময় দেবীর কাছে সাজগোজ একটা ধৃষ্টতা ও কপটতা, কারণ ভগবানের নিকট ভব্যতাই বা কি, আবরণই বা কি—আবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভেবেছেন, ভগবানের নিকট যেতে হ'লে আধুনিক সভ্যতায় রুচি অনুসারে ফিটফাট হয়ে চাপকান-চোগা পরে' যেতে হবে। বস্তুতঃ, এমনি করে' জীবনই হয়ে পড়েছে অভিনয়। ইউরোপীয় আবেষ্টন ভারতীয় অবস্থায় খাপ খাচ্ছে না। শুধু তা নয়, সমগ্র ভাব ও মনোবৃত্তি ইদানীং বদ্‌লে গেছে ও যাচ্ছে। দুনিয়াকে কল্পনা করা হচ্ছে ছদ্মবেশের জায়গা, কারণ এখানে লড়াই করতে হবে এবং লড়াই করলে নিজের দুর্ব্বলতা দেখান চলে না। লড়াই করতে হলে—সে লড়াই domestic, economic, educational, political বা religious যাই হোক না কেন—বাইরের আয়োজনকে পরিপাটি বলে' দেখাতে হয়। তা না হ'লে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানো বা জব্দ করা সম্ভব হয় না। এমনি করলেই একালে কাজের সুবিধে হয়। মটরকার করে' না চলাফেরা করলে ডাক্তারের পশার হয় না; মটর গাড়ীর আগেকার যুগের কবিরাজ মহাশয়েরা যে-রকম জুড়িগাড়ী হাঁকিয়ে চলতেন—রাজাদেরও সে-রকম থাক্‌ত না—না হ'লে ভিজিট ষোলটাকা করা অসম্ভব হ'ত। অবশ্য চরক বা শুশ্রুতের গ্রন্থে কবিরাজদের এরকম যানবাহন ব্যবহার করার পরামর্শ নেই। মাতৃভক্ত হাইকোর্ট-জজ গুরুদাস ব্যানার্জ্জী মহাশয় বাড়ীতে খড়ম পরতেন, কিন্তু হাইকোর্টে যাওয়ার সময় 'কুকের বাড়ী' হ'তে জুড়ীগাড়ী না এলে তাঁর যাওয়া-আসা সম্ভব হ'ত না।

এ রকম বিপরীত ব্যাপার সমাজের মজ্জাগত হ'য়ে পড়েছে। সমাজের নূতন বাস্তব-বোধ এই রেষারেষি এবং পারস্পরিক বিরোধকেই মুখ্য করে' তুলছে। এজন্য পোষাকে পরিচ্ছদে অহরহ সকলেই পরস্পরের চোখে ধূলি দিচ্ছে। বস্তীর গৃহকোণ হ'তে যে যুবক রেশমের বস্ত্র, কুঞ্চিত বসন, বহুমূল্যের পাদুকা নিয়ে বেরুল তাকে দেখ্‌লে একটা ব্যাপার বলেই ভ্রম হবে—অথচ ওদিকে গৃহে হয়ত অন্নই নেই। একজন স্বাধীন রাজাকে একবার কল্‌কাতার কোনো জমিদার-রাজা নিজের গৃহে অতিথিরূপে আমন্ত্রিত করেন। স্বাধীন রাজা জমিদারের বাড়ীর বাগান, ড্রইংরুম, ছবি, মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখে অবাক হয়ে যান। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, জমিদারের আয় কত? অর্থাৎ যার আয় দু'লাখ টাকা তিনি চালবাজি করছেন পঞ্চাশ লক্ষের ভড়ং দেখিয়ে। পঞ্চাশ লক্ষ যার আয় তার বাড়ীও এরকম হয় না। কল্‌কাতার কোন জমিদার-রাজা ত' এক প্রাসাদকে 'দুর্গ' নামেই অভিহিত করলেন! তা'তে নিশ্চয়ই হয়ত সিন্ধিয়া মহীশূর প্রভৃতির সমান তাল সৃষ্টি হ'ল।

যে যা নয় তা দেখানো হ'য়ে পড়েছে বহিরঙ্গ সভ্যতার প্রধান কীর্ত্তি। এটা ভারতে এখন চলছে। অন্তঃসার শূন্য অলীকতা publicityর খাতিরে হ'য়ে পড়েছে বাস্তব। এ রকমের সামাজিক অবস্থা হচ্ছে নব্য সভ্যতার সৃষ্টি। এক সময় নিজেকে প্রশংসা করতে বা নিজের কাগজে নিজের কোন কীর্ত্তি উল্লেখ করতে ভারতের বিবেক কুণ্ঠিত হ'ত। এখন এর-ওর স্বর্ণজুবিলি বা জয়ন্তী প্রভৃতি কাজ নিজেদের ফরমায়েস ও অনিচ্ছ আয়োজনে পূর্ণ হয়। এদেশের চোখে এ সব হচ্ছে ইতরতা—অথচ এ যুগের চোখে তা' হয় না। কারণ এ যুগ মনে করে, সকলকে জয় করা বা পরাভূত করা যখন লক্ষ্য তখন যা করা যায় তা'ই ভাল—"nothing unfair in love and war". প্রত্যেক কাজই এজন্য নাটকীয় ভঙ্গীতে করে' সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া হ'ল আধুনিক সভ্যতার পরম পুরুষার্থ। অনেকে বাড়ীতে সেজে-গুজে থাকেন বন্ধু-বান্ধবদের

অভ্যর্থনা করতে—তাদের হতশ্রী বা হতভম্ব করাই হ'ল এঁদের লক্ষ্য। এ সমস্ত বহিরঙ্গ অভিনয় যেন এ যুগে অনিবার্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তর কেউ খুলতে চায় না—নিজেদের কোন রকম দুর্ব্বলতা জগতকে জানাতে কেউ প্রস্তুত নয়।

অর্থনৈতিক দিক হ'তে এতে এসেছে বিপর্য্যয়। যে-সব দেশের যান্ত্রিক প্রাচুর্য্য অর্থাগমের পথ অবারিত করেছে এবং পৃথিবী শোষণ করে' ধনাগমের ব্যবস্থা করছে সে-সব দেশে এই প্রেরণার খাতিরে standard of living বেড়ে যাচ্ছে। সকলেই অধিকতর ধনী হচ্ছে—ভোগের উপকরণ বাড়্‌ছে, স্বাস্থ্য অটুট হচ্ছে—ধনীর বা রাজার ভোগ্য আমোদ-প্রমোদ সর্ব্বসাধারণের আয়ত্ত হচ্ছে। তা'তে করে' ইউরোপের ভাষায় superman তৈরী হচ্ছে। আবার যে-দেশে এ রকমের অফুরন্ত ধনাগমের পথ প্রশস্ত নয়—সে-দেশে এ রকমের বাস্তবতা অনেকটা খলতায় পরিণত হচ্ছে—কারণ, তা'তে standard of living বাড়তে পারছে না—গৃহে কান্নাকাটিই হচ্ছে বেশী। যাঁর একশো টাকা আয়, তিনি যদি পাঁচশো টাকা আয়ের হিসেবে চলেন—যাঁর হাজার টাকার সঙ্গতি, তাঁর খরচ হয় যদি পাঁচ হাজার টাকা—তাহলে হ'য়ে যায় শোচনীয় পরিণতি। এজন্য শোনা যায় কল্‌কাতার অধিকাংশ বাড়ী ও জমিদারী ভারতের ইহুদী-স্থানীয় মাড়োয়ারীর কবলে এসেছে। এদের বহিরঙ্গ ভড়ং নেই—লোটাকম্বল নিয়ে এরা বেমালুম চল্‌তে ফিরতে অভ্যস্ত।

অথচ ইউরোপের এই বাইরের কাঠামো রক্ষা করার আদিম উৎসাহ এখানে ঠিক ভাবে অক্ষুণ্ণিত হচ্ছে না। ইউরোপ সময়ের মূল্য বোঝে, নিজের দায়িত্ব বোঝে, তাই সমগ্র মনোবৃত্তিকে সফলতার উপায় স্বরূপ করে' নিয়েছে। এ দেশ কিছুতেই এই পাশ্চাত্য প্রেরণা অনুভব করছে না। এখানকার ঢিলে কাজ, ঢিলে পোষাক, ঢিলে ভাব, ভারতের অন্তরঙ্গ সমর্পণ-তত্ত্বের আলোকে তৈরী। একটি পরিবারের সকল ব্যক্তির ভিতর যেমন একটা অবাধ প্রশ্রয়ের আয়োজন আছে—সমাজেও এই প্রশ্রয় অব্যাহত হ'য়ে আছে। যে-কাজ এক দিনে করবার তা পাঁচ দিনে করলেও কারও আপত্তি নেই। কাজে-কর্ম্মে ফাঁকি দেওয়া অপরাধ মনে করা হয় না। এমনি করে' সময়ের মূল্য বোধ সম্ভব হয় না। দুনিয়া যুদ্ধের ক্ষেত্র—প্রত্যেককে নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কাজ এগিয়ে নিতে হবে—এভাব এদেশে নেই বলে' ঘট্‌ছে বিপর্য্যয় ও বিপদ।

আমাদের বাস্তবতা যে এমন জীর্ণ-শৈথিল্য, ব্যাপক-দারিদ্র্য ও ব্যর্থতার উপর নিহিত তা' নব্যশিক্ষিত তারুণ্যের চোখে পড়ছে না। ইংরাজের ইতিহাস ও বার্কের বক্তৃতা পড়ে' আমাদের সামাজিক ইতিহাসে তাদের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা কষ্টকর। ওদেশে যে বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষের উপর জাতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, এ দেশে তা নেই। এজন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে এখানে যুদ্ধ হয় না। কাজের ভাগে (Division of labour) নিজেদের স্বতন্ত্র আসন মেনে নিতে সকলেই প্রস্তুত। এ দেশ শান্তিকামী অথচ বিপ্লবের বাণী আস্‌ছে ইউরোপ থেকে। আজ সোসিয়ালিজম কমিউনিজম ও রুষীয় সোভিয়েট-ধর্ম্মের কথা ইউরোপের prolitariat সাহিত্য এ দেশে বন্যার মত নিয়ে আস্‌ছে। সকলেই Pierro Leronx-এর রোগনির্ণয় মেনে নিচ্ছে এবং মনে করছে এদেশেও দুটি ঝগড়াটে দল আছে ওদেশের মত, যেমন বুর্জ্জোয়া ও প্রোলিটারিয়েট। মার্কসের

Sociological theory of evolution এখন হঠাৎ বাইবেলের বাণীর মত হয়েছে। প্রুদোঁর প্রধান বই "What is property ?"-তে এই প্রশ্নের যে-উত্তর আছে তা' হচ্ছে "Property is theft". গরীবেরা শিক্ষা পেয়ে এখানেও ধনী Industrialist ও Bankerদের thief বল্‌তে শিখেছে। অথচ ইউরোপের background এ দেশে নেই এবং এখানকার ধন একটা equitable distributionকে কখনও অস্বীকার করে নি। রাজারাও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে' সকল ধন সাধারণের নিকট এক সময় বিলিয়েছেন। কাজেই এখানে 'Theft'-এর কারণ পাওয়া যাবে না। এখানকার সমাজও Communistic ভিত্তির উপর এক সময় গঠিত ছিল, অথচ এ-Communism খাঁড়া হাতে অগ্রসর হয়নি। ফলে দাঁড়িয়েছে আবদার ও আলস্যের অত্যাচার। কোন সংগ্রাম, সংঘর্ষ, ত্যাগ ও অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে না গিয়ে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ পাওয়া সম্ভব কি ? আমাদের তরুণদের মনোবৃত্তিতে Survival of the fittest-এর উগ্র বাণী নেই। একটা চাকরী পেলে হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত-ভাবে ঘুমোতে পারলে বাঁচে। বস্তুতঃ efficiency-র জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার পেছনে যে সাধনা আছে তার মূলে হচ্ছে ইউরোপীয় তত্ত্বের গোড়াকার কথা, অর্থাৎ "The world is a fight". সব জায়গায় এই যুদ্ধের দিক থেকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা এবং "Dying in harness" হ'ল পশ্চিমের লক্ষ্য। এ দেশের আবহাওয়ায় ও-দেশের চারাগাছ এজন্য কিছুতেই ফলিত হচ্ছে না।

এ দেশের উপবাসবাদ, কৌপীনবাদ ও সন্ন্যাসবাদের মূলে আছে আলস্যের মধুচক্র। সামান্য খেয়ে থাকতে পারলে পরিশ্রম কেন ? অভাবকে কম করা মৃত্যুর লক্ষণ, অভাবকে বাড়ানো হচ্ছে সভ্যতার লক্ষ্য। এ দেশ মস্‌লিম ও কিংখাবের দেশ—এক সময় অশ্রান্ত সাধনায় এসব মঞ্জরিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে এ সমস্ত কারুদ্রব্যকে বনিকগণ বহন করে' নিয়ে যেত। কিন্তু মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি সমগ্র দেশের প্রেরণাকে জীর্ণ করেছে। কাজেই আজ মায়াবাদীরা কি করে' কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাবে ? এখানকার বাস্তবতা এই সমস্ত উপকরণে তৈরী। ইউরোপের অনিদ্র রজনীর কর্ম্মপ্রবণতা, দায়িত্বজ্ঞান ও অশ্রান্ত কর্ম্মসাধনা এ দেশে কি করে' রূপায়িত হবে ? সে জন্য নূতন ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন প্রয়োজন এবং নূতন বাণীতে এই চক্রের অগ্রগতিকে ধ্বনিত করতে হবে।

খেয়া বন্ধ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

সন্ধ্যার আগে খেয়া-ঘাটে পৌছানো চাই। রাত্রে আবার পদ্মা পারাপার করে না।—দ্রুতই চলিয়াছিলাম।

ভাদ্রের আকাশ মেঘে ঢাকা। আলোর চেহারা দেখিয়া মনে হইল যে, সূর্য্য বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছে। কিন্তু হাতের ঘড়িতে দেখিলাম, এখনও সূর্য্য ডুবিতে পারে নাই, মিনিট কুড়ির মত বাকী এখনও আছে। আজ সারা দিন সূর্য্যের দেখা পাওয়া যায় নাই, মেঘের আড়ালে আড়ালেই আকাশ পাড়ি দিয়া গিয়াছে,—একটা ষ্টীমার যাইতেছে, তার পাখায় জলকাটার শব্দ এখান হইতে শুনিতেছি এবং উত্তরে মেঘলা আকাশেও তার ধোঁয়ার কুণ্ডলী-রেখা দেখা যাইতেছে। নদী এখনও মাইল দেড়েক দূরে,—গতি আর দ্রুততর করিবার শক্তি ছিলনা, একটানা ছয় ঘণ্টা হাঁটিয়া আসিয়াছি।

দু'পাশের মাঠ জলে জলময়, ধান ও পাট গলাজলে ডুবিয়া আছে,—এর মধ্যে রাস্তাটা একটা লম্বা মরা সাপের মত ভাসিতেছে। পূবের বাতাস ক্রমেই জোরালো হইয়া উঠিতেছে, —এ বাতাসে নাকি জল আরও ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে। বাতাসে কেমন একটা সোঁ-সোঁ ডাক, এদিকে অন্ধকারও হইয়া আসিতেছে,—নির্জ্জন মাঠে একা একা চলিতে মানুষকে এখন বুদ্ধুদের মত কত অকিঞ্চিৎকর, ক্ষীণায়ু ও ভঙ্গুর মনে হয়।

সামনেই একটা সাঁকো দেখা যাইতেছে। জলের ডাক কানে আসিল,—খালের জল সাঁকোর তল দিয়া মাঠে নামিয়া যাইতেছে। আগাইতেই দেখিলাম, কে একজন পুলের উপর রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূর হইতে প্রথম বুঝিতে পারি নাই, কাছাকাছি আসিতে দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক। এই মাঠের মধ্যে এই সময়ে রাস্তায় মেয়ে লোক,—যতদূর তাকাইতেছি ধারে-কাছে কোন গ্রামও দেখিতেছি না, সঙ্গে কোন লোকজনও নাই, একা পথ চলিতেছে, ব্যাপারটা যেন কেমন ঠেকিতে লাগিল।

খাল হইতে একখানা ডিঙ্গি-নৌকা সাঁকোর তল দিয়া ওপাশের মাঠে গিয়া পড়িল। লোকটি স্ত্রীলোকটিকে ডাকিয়া কি যেন কহিল, কিন্তু দূর হইতে কথাটা ঠিক শুনিতে পাইলাম না। মনের অজানা কিছু নাই, বহু-অভিজ্ঞতা তার, আন্দাজেই বলিয়া দিল,—প্রথম বক্তব্য, এমন দিনে তারে বলা যায়। দ্বিতীয় বক্তব্য—কি রয়েছে তব পসরায়। এবং তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ বক্তব্য—আমার নায়ে হবে তোমার স্থান।

আরও কিছু বলিবার, কিম্বা আরও খানিকটা বেশী ইচ্ছা লোকটির হয়তো ছিল, কিন্তু কাছে মানুষ আসিয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া চুপ করিয়া গেল। স্রোতের টানে নৌকাও তার ইতিমধ্যে দূরে সরিয়া পড়িল।

সাঁকোর উপর উঠিয়া স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "খেয়াঘাট এখান থেকে আর কদ্দুর ?"

"দূর আছে, প্রায় মাইল খানেক।"

চাহিয়া দেখিলাম, বয়স কুড়ির নীচে। জাতিও অনুমান করিয়া ফেলিলাম, নিম্ন শ্রেণীর। সৌন্দর্য্য আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য চোখ এড়াইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "খেয়া ঘাটে যাবে নাকি ?"

"হুঁ" বলিয়া মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

"আজ আর বোধ হয় খেয়া পাবে না, কোথায় যাবে ?"

"ওপারে।"

"ওপারে কি ?"

"আমার বাপের বাড়ী, সেখানেই যাব।"

"কোত্থেকে আসছ ? একা যে, সঙ্গে কেউ নেই নাকি ?"

সঙ্গে লোক থাক বা না থাক আমার তাতে কি, রাগই বা হয় কেন?

একটা মাছরাঙা একটু দূরে রেলিং-এ বসিয়া আছে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, গর্ত্তে কখন যাইবে ? পিছনে ফিরিয়া কাহাকেও আসিতে দেখিলাম না। সামনেও কেহই আসিতেছে না। যতদূর চাহিয়া দেখিতেছি মেঘ্‌লা আকাশের তলে কেহ কোথাও নাই—ডিঙ্গি নৌকা দূরে কোথাও কোন পাটক্ষেতের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।

সামান্য যতটুকু শুনিলাম, তার সঙ্গে নিজের সাধ্য মত যোগ করিয়া লইলাম। নিশ্চয় স্বামীর বাড়ী হইতে পলাইয়া চলিয়াছে, হয়তো পিত্রালয়েই যাইতেছে। হয়তো অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা পিছনে রহিয়া ধাক্কা দিয়াছে, কিম্বা হয়তো কিশোর দিনের প্রেম অহরহ সম্মুখে পিত্রালয়ে আকর্ষণ করিয়াছে,—তাই, অবশেষে আজ একাকী বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

কহিলাম, "আমিও খেয়াঘাটেই যাচ্ছি। এই রাস্তা বরাবর নদীর ঘাটে গিয়ে থেমেছে।"

আর অপেক্ষা করিলাম না। একটা বিড়ি জ্বালাইয়া লইয়া আবার দ্রুতপায়ে আগাইতে লাগিলাম। আজ রাত্রেই আমার পদ্মা পার হওয়া চাই—আমি তো আর ওকে ঘর হইতে ডাকিয়া পথে আনি নাই!

খেয়া ঘাটে যখন আসিলাম, তখন ঘড়ির হিসাবে সন্ধ্যা চলিতেছে। কিন্তু বাহিরে তখন রাত্রির অন্ধকার। পূবের বাতাসের জোর আরও বাড়িয়াছে। রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টির আয়োজন আকাশের মেঘে দেখিতে পাইলাম। পদ্মার ঢেউ জল হইতে উঠিয়া আসিয়া পাড়ের উপর অনবরত আছড়াইয়া পড়িতেছে। খেয়া নৌকাটা পাড়ের একটা গাছের সঙ্গে লোহার শিকল দিয়া বাঁধা, তাতে একটা তালা লাগাইয়া খেয়ামাঝি বহুক্ষণ হয় গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে। খালের মুখেও কোন নৌকা দেখিতেছি না, নদীতেও নৌকা নাই। এপার হইতে ওপার এখন দেখা যায় না,—বর্ষার এ দুরন্ত নদী এখন সাঁতার দিয়া পার হওয়াও বিপদজ্জনক। তালাটা বৃথাই কয়েকবার নাড়িয়া দেখিলাম।

এক ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে লাগিল,—বর্ষণ প্রায় তবে আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। ওপারে উত্তর-পূব কোণে বিদ্যুৎ ডালপালা মেলিয়া ঝিলিক দিয়া উঠিল।—ফিরিয়া আসিলাম।

পাড়ে কয়েকটা বটগাছ জায়গাটী ঢাকিয়া এখন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। সপ্তাহে একবার একটা হাটের মত বসে এই গাছতলায়। একটা চালা ঘরও আছে, শুধু নাই কেবল তার বেড়া। সেটার মধ্যে উঠিয়া আসিলাম। আর কিছু না হউক, গাছের ডালের চেয়ে ভালো আচ্ছাদন তো পাওয়া গেল। পত্রিকা খুলিয়া বিছাইয়া লইলাম। পায়ের জুতাজোড়াকে কাগজের ওয়াড়ের মধ্যে মুড়িয়া বালিশ বানাইয়া রাখিলাম। খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়া এখন সুখনিদ্রা যাইতে পারিব। বড় পরিশ্রম গিয়াছে, ডাকিয়া ঠেলিয়া ঘুম না ভাঙ্গাইলে জাগিব না—এ সুনিশ্চিত। দেখিলাম, চালাঘরটার মধ্যভাগেই শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি, বৃষ্টির ছাঁট আর নাগাল পাইবেনা,—নিজের সুখের দিকে, খুঁটি-নাটির দিকে নিজের এত নজর আছে দেখিয়া নিজের 'পর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

পদ্মার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতে লাগিলাম। আরও একটা বিড়ি ধরাইয়া লইয়া তবে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হইব, শিরদাঁড়া টান করিয়া সটান চিৎ হইয়া শয্যায় শুইয়া সেটা টানিব। এখন এটা মুখে লইয়া বসিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

এক সময়ে নিজের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অন্ধকারে একা বসিয়া আছি। মনে হইল, যেন আমি বীরাচারী তান্ত্রিক, গভীর রাত্রের অন্ধকারে এক ভয়াবহ সাধনায় একাকী বসিয়া জাগিতেছি। আকাশের ওপারে বিদ্যুতের ঐ চক্‌মকি ঠোকাটা যদি কেহ বন্ধ করিয়া দিত, তবে এ অন্ধকার সাধনার সামান্যতম বিঘ্নটুকুও দূর হইত।

এক ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ওপারে যাইবার জন্য খেয়াঘাটে এতক্ষণে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দেখিয়াই বুক কাঁপিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিল—"খেয়া বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে ?"

"হুঁ।"

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পরে কহিল—"বৃষ্টি পড়ছে।"

তা' আমি জানি, এ আমার কাছে নূতন সংবাদ নয়। কহিলাম—"হুঁ।"

"এখানে আর কোন ঘর নাই।"—প্রশ্ন করিল, না, বৃষ্টিপড়ার মতই আর একটা সংবাদ দিল বুঝিলাম না।

"আমি ওপাশে যাচ্ছি। কোনমতে রাতটা একঘারে কাটিয়ে দাও।"

কাগজ ক'খানা তুলিয়া একেবারে উত্তরপ্রান্তে সরিয়া আসিলাম। পূর্ব্বের মতই বিছানা পাতিলাম, এবং পাতিয়াই শুইয়া পড়িলাম। সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল বা মাটিতে শুইয়া পড়িল, অথবা সরিয়া পড়িল চাহিয়াও দেখিলাম না। সে যায় নাই, ওপাশে ধূলার 'পরে বসিয়া আছে, না দেখিয়াও পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম।—খদ্দরের চাদরটা ওকে ধার দিলে হইত। মনে হইতেই আরও ভালো করিয়া সেটা গায়ে জড়াইয়া লইলাম, পাছে কেহ ছিনাইয়া লয়।

ভাবিতে লাগিলাম—এমন হইল কেন? এমন ঘটেই বা কেন? ভাগ্যের তাঁতে কি এমনই নক্সার বয়ন-কার্য্য চলিয়াছে?

বর্ষণ সুরু হইয়াছে। বটগাছের ডালপালায় উচ্ছৃঙ্খলতা জাগিয়াছে, — অন্ধকারে কতগুলি কবন্ধ যেন একস্থানে দাঁড়াইয়া বিকৃত উল্লাস করিতেছে। বাতাসের ডাক সমান চলিয়াছে,—খ্যাপা জানোয়ার যেন অন্ধকারে বনে কার পিছু তাড়া করিয়াছে, দাঁতে-নখরে চাপিয়া ধরিতে না পারিয়া আক্রোশে গোঙাইতেছে। পদ্মা প্রলাপ বকিতেছে, অন্ধকারে আচ্ছাদন ফেলিয়া দিয়া যেন মদাতুর নটিনী নিরন্তর টলিয়া টলিয়া পড়িতেছে। উত্তরের আকাশ বিদ্যুতের দাঁত বাহির করিয়া কি একরকম বীভৎস হাসি হাসিতেছে।

নিজেকে ধমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম,—ও কেন আসিল? কি দরকার ছিল ওর আজই পলাইয়া আসিবার! অমন করিয়া ধূলায় বসিয়া আছে কি জন্য, শুইতে কে বাধা দিতেছে? এখানে যদি ভয় করে, নদীতে জল আছে, সেখানে গিয়া আশ্রয় নেয় না কেন? অনন্ত বিশ্রাম পাইবে, সেখানে ভয়ের কিছুই আর থাকিবে না।

হঠাৎ রাগ পড়িয়া গেল,—দৃষ্টি আমার স্বচ্ছ হইল; মিথ্যা ভাবনায় মিছামিছি কষ্ট পাইয়াছি। গূঢ় অন্তরালের ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। অন্ধকার নির্জ্জন হইলেই দেবতা মুখোস খুলিয়া ফেলে, শয়তান বাহির হইয়া আসে। তখন অন্ধকার জুড়িয়া তার কাজ চলে। সারারাত্র বাঘের মুখে হরিণীদের ঠেলিয়া নেয়, গর্ত্তের সাপদের জাগাইয়া ঘুমন্ত পাখীর বাসায় তুলিয়া দেয়, আর অগ্নিশিখায় লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য অন্ধকারের পোকাগুলিকে তীরের মত ঝাঁকে ঝাঁকে ছুড়িয়া মারে। দিনে সে দেবতা, রাত্রে সে শয়তান।—আমি থামোকা ভাবিয়া মরিয়াছি। নিজেকে ধমকাইবার কোনই দরকার ছিল না।···এখন কেহ নাই, চারিধার নির্জ্জন। এমন দিনে—

একটা গরম স্পর্শ লাগিল। কাছে আসিয়া শুইয়াছে, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, এ অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

আস্তে ডাকিলাম—"কি?"

"একা ভয় করে।"

"ভয় কি, সরে' এস।"

হাত বাড়াইয়া আরও সন্নিকটে তাকে টানিয়া লইলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল, উঠিয়া বসিলাম। ভালো করিয়া তাকে দেখিয়া লইব, দেশলাই জ্বালাইলাম। আলোতে দেখিলাম—একটা কুকুর। এটা আবার কখন পাশে আসিয়া শুইয়াছে!

ম্যাচ নিবিয়া গেল, আবার শুইয়া পড়িলাম।

মেয়েটী ওপাশে মাটির 'পর পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সামান্য ব্যবধান, কিন্তু এ-পন্তটাকে ডিঙাইব কেমন করিয়া? এপার—ওপার, মাঝখানে পদ্মার অন্ধস্রোত। খেয়াও বন্ধ—

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণার এর আগে একবারও মনে হয়নি, সত্যি কথা বল্‌তে কি, সে একরকম কিছু না ভেবেই বেরিয়ে পড়েছিল।

এ রাস্তায় বাস চলে খুব কম, বিশেষ করে' এত রাত্রে। কৃষ্ণা অস্থির আগ্রহে প্রতীক্ষা কর্‌ছিল —

যখন কোন-কিছুতেই উৎসাহ থাকে না তখন লোকে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়, নিরুপদ্রব প্রশান্তি কামনা করে। মনকে যেন অনর্থক নাড়া না দেয়—এমন-কিছু না ঘটে যা অথণ্ড অবসরকে ভারাক্রান্ত করে' তোলে—আর হৃৎপিণ্ডে মোচড় দিয়ে যায়। কৃষ্ণা আশা করেছিল এখানে তার মন্থর মুহূর্ত্তগুলো নিরুদ্বেগে কাটাতে পারবে। হেমলতা সম্বন্ধে তার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু রমলার উপর সে নির্ভর করতে পার্‌তো! এক ঝলক অলোয় শাড়ীটা ঝলমল করে' উঠলো—কৃষ্ণা অন্ধকারে একটু আড়ালে এসে দাঁড়াল। সারাটা দিন তার কোনরকমে কাট্‌লো—কিন্তু এখন?

কৃষ্ণা চল্‌তে সুরু ক'রেছে।

গাড়ী থেকে নেমে জয়ন্ত বল্‌লে 'এ-পথে বাস পাবে না কৃষ্ণা।'

'তা জানি।'

'এত রাত্রে পথ হারিয়ে ফেল্‌তেও পার।'

'আমার কথা আমাকেই ভাব্‌তে দিন—আপনাকে আমার এই অনুরোধ জয়ন্তবাবু!'

জয়ন্তর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে' কৃষ্ণা চল্‌তে লাগলো। জয়ন্ত শুধু বল্‌লে, 'তোমার অনেকদিনের অনেক কথাই আমাকে ভাব্‌তে হ'য়েছে কৃষ্ণা। আশা করি, এত অল্প সময়ে তা ধুয়ে-মুছে যায়নি।'

'আপনি কি জোর করে' আমার উপকার করবেন নাকি? আপনার সিভল্‌রি ত কম নয়!'

'অন্য সময় হ'লে এর উত্তর দিতে পার্‌তাম, কিন্তু এই শীতে অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ আছে কৃষ্ণা?'

'কেন নেই? আপনি কি মনে করেন আপনি এখন ডাক্‌লেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি!'

'না পারো না।' জয়ন্ত এসে কৃষ্ণার হাত ধর্‌লে। 'দু'দিনে কি এতই দূরে সরে গিয়েছি যে সামান্য আত্মীয়তার সম্পর্কটুকুও আর আমার সঙ্গে রাখা চলে না?

কৃষ্ণার পক্ষে এবার অসম্ভব হ'লো, তবু একবার জোর কর্‌লে।

জয়ন্ত বল্‌লে 'তোমার হস্‌টেল পর্য্যন্ত আমি যাবোই, সে তুমি যাই মনে কর না কেন।'

মটর চলছে। কৃষ্ণা অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে আছে। এত শীতেও তার কপালটা ঘেমে উঠেছে। অনেক ইতস্ততঃ করে' অনেক পরে কৃষ্ণা ডাক্‌লে, 'জয়ন্ত।'

জয়ন্ত কোন উত্তর দিলে না।

কৃষ্ণা বললে, 'তোমার বিশ্বাস একা আমি যেতে পারতাম না ?'

'তোমার কথা নিয়ে আর ত আমি ভাবি না।' জয়ন্ত বললে।

'যা বলেছি, সে কি সত্যি নয় ? তুমিই বলো।'

'কি সত্যি ?'

'যাও, আমি জানি না।'

'একটু সরে' বসো কৃষ্ণা—একটু অন্যমনস্ক হ'লেই য়্যাক্সিডেণ্ট।'

নিস্তব্ধ অসাড় রাত্রি। দূরে ফুটপাতের একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রাণহীন জড়স্তূপের মত কা'রা পড়ে' আছে। সহরের রাজপথও তাদের পক্ষে অবারিত নয়, মাঝে মাঝে পুলিসের দু'একটা লাঠির আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে। কুয়াশার অবগুণ্ঠন ঠেলে দু' একটা স্বচ্ছ তারা উঁকি মারছে। হু-হু শব্দে মটর ছুটিয়ে, অনেক পথ পার হয়ে, জয়ন্ত এক জায়গায় এসে গাড়ী থামালো। কৃষ্ণা নিঃশব্দে নেমে এলো, তারপর দুজনেই চুপ ;—কারও মুখে কোন কথা নেই।

'এখন দেখ্‌ছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত কাটাতে হবে।' অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণা বল্‌লে।

'তবু ত আমাকে সঙ্গে আন্‌তে চাও নি।'

'এনেই বা কী-লাভ হ'লো ?'

'তুমি যদি বলো—এখুনি scale করে' পাঁচিল পার হতে পারি।'

'থাক্, অত বীরত্বে কাজ নেই। মেয়েদের হস্‌টেল বলে' উৎসাহ একটু বেশী—কি বলো ?'

'হতে পারে। তোমাকে সঙ্গে করে' মটরে ঘুরতেও আমার উৎসাহ কম নেই জেনো।' জয়ন্ত একটু হেসে গাড়ীর দিকে ফিরে এলো।

কৃষ্ণা সন্ত্রস্তভাবে জড়োসড়ো হয়ে জয়ন্তর পিছনে এসে বল্‌লে, 'চল্‌লে নাকি আমাকে ফেলে ?' কৃষ্ণা জয়ন্তর আগেই গাড়ীতে উঠে বস্‌লো।

জয়ন্ত না হেসে আর থাকতে পারলে না : 'এত ভয় তোমার !'

'কোথায় যাবে শুনি ?'

'উপস্থিত ত পেট্রলের দোকানে,—গাড়ীতে একটুও তেল নেই।'

'তারপর ?'

'তুমি যদি রমলার কাছে যেতে চাও'—

'তুমি কি ঠাট্টা কর্‌ছো ?'

'ঠাট্টা নয় ;—সমস্ত দিন সেখানে কাটাতে পারলে বাকী রাতটুকু কি আর সেখানে কাট্‌তে পারে না ? বিশেষতঃ হস্‌টেলের দরজা যখন বন্ধ।'

'রমলার অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কষ্ট, কিন্তু বিশ্বাস করো, এর পিছনে মাসীমার কোন উদ্দেশ্য আছে যদি টের পেতাম তবে নিশ্চয়ই যেতাম না জেনো।' কৃষ্ণা হুডের বাইরে মুখটা বের করে' বাতাসে হাতটা মেলে ধরেছিল, জয়ন্ত হাতটা সরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'তা আমি

যদি বলি সেই জন্যেই তুমি সেখানে গিয়েছিলে।'

'তার মানে !' একটু থেমে কৃষ্ণা আবার বল্‌লে, 'তুমি যা বল্‌তে চাও তা আমি বুঝতে পেরেছি—কিন্তু এতদিন পরে তুমি যে আমার সম্বন্ধে এতটা হীন ধারণা করতে পারো এ আমি কোনদিনই বুঝ্‌তে পারিনি—আমি স্পাই নই জয়ন্ত।' কৃষ্ণা আর কোন কথা বল্‌তে পারলে না।

'আমার যাবার কথা কি তুমি জান্‌তে না ?'

'না।—এতদিন যে তুমি সেখানে যাওয়া-আসা করছো—এ-সব কি আমার ভায়েরীতে টুকে রেখেছি মনে করো।' এতটা উত্তেজিত হয়ে জয়ন্ত-র সঙ্গে কোন দিন সে কথা বলেনি। অনেক দিনের অনেক কথাই তার বলা হয় নি। আজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে-সব কথা বেরিয়ে আস্‌ছিল, তা সে কোনদিনই চায়নি।

পেট্রল-পাম্প অতিক্রম করে' যখন তারা সহজভাবে পথ চল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে জয়ন্ত আরম্ভ করলে, 'কৃষ্ণা, তোমাকে অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে কত কঠিন তা কি তুমি জানোনা ?'

'অন্ততঃ মুখে সে-কথা বলো বটে !' কৃষ্ণার গলার স্বর রুক্ষ।

দু'টি মন পাশাপাশি থেকে দু'জনার অজ্ঞাতেই যেন বহু দূরের ব্যবধান রচনা করছে।

জয়ন্ত বল্‌লে, 'মাসীমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কত কথাই ত তুমি জানিয়েছ—অশোকের সম্বন্ধে সেখানে কোন উল্লেখ নেই—হয়ত এটা তোমার অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণা—'

জয়ন্তকে বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে কৃষ্ণা বলে' উঠ্‌লো, 'কি তুমি বল্‌তে চাও ?'

'বল্‌তে কিছুই চাই না—জান্‌তে চাই।'

'যা জান্‌বার নিশ্চয়ই জেনেছ—' কৃষ্ণার অস্বাভাবিক স্বর শুনে জয়ন্ত ভয় পেল। শেষ পর্য্যন্ত যে এত মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তা সে আশা করেনি। কৃষ্ণা অস্বস্থভাবে খানিকটা হাস্‌লে—তার দু' চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়্‌ছে—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, 'অনেকদিন আগের তোমার একটা কথা মনে হচ্ছে,—হ্যাঁ পারো—তোমরাই পারো জয়ন্ত—কিন্তু এর কি দরকার ছিল !' নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হ'চ্ছে—কৃষ্ণা অনেক কষ্টে ও-কথাগুলো বল্‌লে।

কৃষ্ণার চোখের সাম্‌নে প্রেত-হাতের ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। জীবনের অনেকগুলি বছর তার সঙ্কীর্ণ দেয়ালের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় কেটেছে ; তারপর উদার আকাশের নীচে অনেকখানি আলো সে দেখতে পেয়েছিল, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে উচ্ছ্বসিত পৃথিবীর সে-রূপ এখনও তার চোখে লেগে রয়েছে। অনেকদিন পরে মায়ের করুণ মুখখানি তার মনে পড়্‌লো—নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে যখন সে সব-দিক দিয়ে অসহায় তখনই তার মা'কে মনে পড়ে।

ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া

ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সমরসচিব হোর বেলিশা তাঁর স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ মারফৎ জানিয়েছেন যে, ফিন্‌ল্যাণ্ডের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে' যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে বৃটিশের বিচক্ষণ দৃষ্টিতে রাশিয়ার চাল-চলন আর আদৌ বরদাস্তযোগ্য বলে' বিবেচিত হচ্ছে না। নাৎসী বর্ব্বরতার প্রতিকার-কল্পে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লেও বৃটেন এ-যাবত রাশিয়াকে প্রকাশ্যভাবে 'শত্রুপক্ষ' বলে' ঘোষণা করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু রাশিয়া যখন প্রবল পরাক্রমশালী বৃটেনের ন্যায়নিষ্ঠ সহিষ্ণুতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে উত্তরোত্তর তাচ্ছিল্যের ঔদাসীন্যে উন্নাসিক, তখন, বৃটেনের পক্ষে চরম-পন্থার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কী? সুতরাং বৃটেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। অতঃপর ভূতপূর্ব্ব সমরসচিব 'লেনিনগ্রাড্' আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছেন।

মিঃ হোর বেলিশার এই মহামূল্য পরামর্শ ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার মেজাজ-মাফিক্ হ'ল কিনা তা' অবশ্য অবিলম্বে সংবাদপত্রের দৌলতে ষ্টালিনের বিপর্য্যস্ত কার্য্যক্রম থেকেই দেখবার সৌভাগ্য ঘটবে। ইতিমধ্যেই ত সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে, 'বাকু'-অঞ্চলে কিছু-কিছু বিপক্ষ সৈন্যের সমাবেশ দেখে ষ্টালিন হাত-পা গুটিয়ে প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে ব'সেছেন।

আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকেও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে' রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে প্রচ্ছন্ন কুয়াশা ঘনিয়ে উঠছে। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত, সোভিয়েট-সূর্য্যের হাতে এই কুয়াশার অপমৃত্যু না ঘটলে অন্তত আরোও কিছুদিন অনবদ্য শান্তির স্বপ্ন দেখা যাবে!

ভারতের স্বাধীনতা ও লর্ড জেটল্যাণ্ড্

বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর দিল্লী-আলোচনার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড 'Sunday Times' পত্রিকা মারফৎ যে-বাক্যামৃত পরিবেশন করেছেন, কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রতিবাদে তা' গলঃকরণ করে' বসে' আছেন। —দুঃখ এই, লর্ড জেটল্যাণ্ডের নিকট থেকে তাঁদের নির্ভেজাল আন্তরিকতার ন্যূনতম পুরস্কার ত জুটলোই না, উপরন্তু ভারতসচিব তাঁদেরকে 'নন্দঘোষে'র পর্য্যায়ভুক্ত করে' মন্তব্য করেছেন, 'কংগ্রেস-নেতারা যতদিন তাঁদের বর্ত্তমান মনোভাব অটুট রাখবেন ততদিন কোনো সম্মানজনক নিষ্পত্তির সম্ভাবনা নেই।···আর, কংগ্রেস-নেতারা 'স্বাধীনতা' শব্দটি নিয়ে যে-পরিমাণ মাতামাতি আরম্ভ করেছেন, অধিকাংশ ভারতীয়ের প্রকৃত লক্ষ্য ও মনোভাব সম্বন্ধে বৃটেনের ঠিক সেই পরিমাণ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।' ভারতসচিব বিশ্বাস করেন যে, অধিকাংশ ভারতবাসী স্বায়ত্বশাসন দাবী করলেও, বৃটিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে আদৌ ইচ্ছুক নয়। কারণ, বর্ত্তমানের উন্মত্ত জগতে বৃটেনের স্থলশক্তি ও নৌশক্তি তাদেরকে যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছে তার সম্বন্ধে তা'রা সর্ব্বদাই বিশেষভাবে সচেতন; এবং কার্য্যক্ষেত্র ও সংস্কৃতিগত উৎকর্ষের দিক দিয়েও বৃটেন ও ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে যে-বন্ধন বিদ্যমান তা আজ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে ছিন্ন করলে উভয়েরই সমূহ ক্ষতি হবে। আর, ভারতকে আজ স্বাধীনতা দিলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দেশীয় নৃপতি, য়ুরোপীয় স্বার্থ ও দেশরক্ষা—এই সব জটিল সমস্যার সুসমাধান হবে বলে' তিনি বিশ্বাস করেন না। সুতরাং 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে অত উঁচু গলায় উচ্চারণ করা কংগ্রেসের দিক থেকে অযৌক্তিক।···

কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক কর্ণধারগণ অতঃপর আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে বিকল্প-অর্থে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা করছেন কি না জানি না, তবে তাঁদের অভিমান-ক্ষুব্ধ চিত্তের নাতিশীতোষ্ণ অভিব্যক্তি হিসেবে গান্ধীজী সতেরোই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় বলেছেন, 'Between the two—the Nationalist and the Imperialist—there is no meeting ground. If, therefore, Lord Zetland represents the British Government's considered view, it is a declaration of war against nationalist India.'—গান্ধীজী ত সিয়ার লোক! ভারতসচিবের মুখ থেকে স্পষ্ট কথা শোনার পরও তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতার থলি একটুও হাল্‌কা হয়নি। কিন্তু পরাধীন ভারতবাসী উত্তেজনার মোহে পাছে তাঁর উক্তির অপব্যবহার করে এই আশঙ্কায় তিনি বলেছেন, 'The battle will come at the right time when it is clear beyond doubt that there is no escape from it·····It is a great mistake to suppose that the revolutionary instinct will die, if the garnered energies of the people have no outlet. This may be true of violent revolution but it is utterly wrong of non-violent revolution.'

ঈশ্বরের অপার মহিমার সঙ্গে গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক মাহাত্ম্যের যেখানে সাক্ষাৎ-সম্পর্ক সেখানে আর কোনো কটাক্ষপাত একেবারেই অসঙ্গত ও অশোভন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হক বাঙলার সাম্প্রদায়িক বিবাদের অবসান-কল্পে হিন্দু ও মুসলমানদের যে সংযুক্ত বৈঠক আহ্বান করেছেন, আগামী চব্বিশে ফেব্রুয়ারী তার অধিবেশন আরম্ভ হবে। এই বৈঠকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতারাই সমবেত হবেন বলে' জানা গেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু, সাম্প্রদায়িকতার জটিল সমস্যা সমাধান করতে হ'লে যে-আপোষ-নিষ্পত্তির মনোভাব সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন, বাঙ্‌লার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর অভিভাবকত্বের আমলে তা' সম্ভব কি ?

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি

রেল কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শীঘ্রই রেলে যাত্রী ও মালের ভাড়া বাড়ানো হবে। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে কার্য্যে পরিণত হ'লে সাধারণ যাত্রীদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকবে না—বিশেষ করে' তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের। এখানে বলা দরকার যে, ভারতীয় রেলপথের অধিকাংশ আয়ই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পকেট থেকে আসে। তৃতীয় শ্রেণীতে সাধারণত যারা চলা-ফেরা করে তারা প্রায় সকলেই দরিদ্র। এই দরিদ্রদের অবস্থা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে আরোও শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ-অবস্থায় রেল কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়া বৃদ্ধি করলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই সব চাইতে বেশি বিপদে পড়বে।

ভাড়া বাড়ানোর সংকল্প ত্যাগ করে' রেল কর্ত্তৃপক্ষ যদি সর্ব্বাগ্রে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধা সম্বন্ধে যত্নবান হন তাহ'লে লাভের অঙ্ক আপনা থেকেই মোটা হ'তে থাকবে।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ম্ময় রায়
১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭১।১, পটুয়াটোলা লেনের
'ইণ্ডর প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়